सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

ভারত :
প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল

একাদশ শ্রেণির ভূগোল পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

ত্রিপুরা সরকার

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৯
পুনমুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : অরূপ চৌধুরী

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

মূল্য : ৬৫ টাকা মাত্র

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল
সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

©এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভারত :
প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল

একাদশ শ্রেণির ভূগোল

*(এন সি ই আর টি-র ~ **India Physical Environment** পাঠ্য পুস্তকের ২০১৮ সালের অনূদিত সংস্করণ)*

অক্ষর বিন্যাস
অরূপ চৌধুরী
সন্তোষ দেবনাথ
ঝুটন দাস

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক,
এন ই আর আই ই (এন সি ই আর টি), শিলং
ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক,
আর আই ই (এন সি ই আর টি), ভূবনেশ্বর

অনুবাদক

শ্রীমতি গৌরী মজুমদার (ধর), শিক্ষিকা
শ্রীমতি অর্পা রায়চৌধুরী, শিক্ষিকা
শ্রীমতি ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ, শিক্ষিকা
শ্রীমতি শর্মিলা দেব্বর্মা, শিক্ষিকা
শ্রীমতি সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা
শ্রীমতি পুজাঞ্জলী ভৌমিক, শিক্ষিকা

ভাষা পরিমার্জনা

শ্রী প্রবুদ্ধসুন্দর কর, শিক্ষক
শ্রী সৌমিত্র কিশোর সরকার, শিক্ষক
শ্রী আশিস দেবনাথ, শিক্ষক
শ্রী বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষক
শ্রীমতি শুক্লা সিংহ, শিক্ষিকা
শ্রীমতি সোনালী ভট্টাচার্য্য, শিক্ষিকা

প্রাক্‌কথা

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলোকে প্রকোষ্ঠবদ্ধ করার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে, ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে কিনা, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে

পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক এম এইচ কুরেশি মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIRPERSON, ADVISORY COMMITTEE FOR TEXTBOOKS AT THE SECONDARY LEVEL

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

CHIEF ADVISORS

M. H. Qureshi, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

MEMBERS

Aparna Pandey, *Lecturer*, DESSH, NCERT, New Delhi

Ashok Diwakar, *Lecturer,* Government P.G College, Sector 9, Gurgaon

B. S. Butola, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Beena Srikumar, *PGT,* CRPF Public School, New Delhi

Noor Mohammad, *Professor,* Delhi School of Economics, Delhi University, Delhi

MEMBER-COORDINATOR

Tannu Malik, *Lecturer*, DESSH, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

The National Council of Educational Research and Training acknowledges the contribution of Bhagirathy Jhingran, *Teacher,* Pathways World School, Gurgaon in the development of this textbook; the National Bureau of Soil Survey and Landuse Planning (under ICAR), Government of India, for providing input for the chapter on Soils. Special thanks are due to Savita Sinha, *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences and Humanties for her valuable support at every stage of preparation of this textbook.

The Council is thankful to the Survey of India for Certification of Maps given in the textbook. It also gratefully acknowledges the support of individuals and organisations as listed below for providing various photographs used in this textbook — M.H. Qureshi, *Professor*, CSRD, JNU for Figure 2.4, 5.4, 5.5, 6.1 and 6.4; B.S. Butola, *Professor,* CSRD, JNU for Figure 7.1, 7.5, 7.7 and 7.9; M.V. Srinivasan, *Lecturer,* DESSH, NCERT for Figure 7.3; ITDC/Ministry of Tourism, Government of India for Figure 2.1, 2.3, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.3, 4.4, 5.7 and 6.6; Ministry of Environment and Forest, Government of India for Figure 2.9, 5.1 and 5.6; *Social Science* Textbook for Class VII, Part II (NCERT, 2005), for Figure 5.3 and *Social Science* Textbook for Class VIII, Part II (NCERT, 2005), for Figure 2.10 and 6.5.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of Anil Sharma and Arvind Sharma, *DTP Operators;* Sameer Khatana and Amar Kumar Prusty, *Copy Editors;* Bharat Sanwaria, Shreshtha and Deepti Sharma, *Proof Readers;* Dinesh Kumar, *Computer Incharge*, who have helped in giving a final shape to this book. The contribution of the Publication Department, NCERT is also duly acknowledged.

The following are applicable to all the maps of India used in this book

© Government of India, Copyright 2006

1. The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
3. The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh.
4. The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act.1971," but have yet to be verified.
5. The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India.
6. The State boundaries between Uttaranchal and Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand, and Chhattisgarh and Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
7. The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

সূচিপত্র

একক - I :	ভূমিকা		পৃষ্ঠা
	অধ্যায় - 1	ভারত : অবস্থান	২
একক - II :	ভূপ্রকৃতি		
	অধ্যায় - 2	গঠন ও ভূ-প্রকৃতি	৮
	অধ্যায় - 3	জলনিকাশি ব্যবস্থা	২১
একক - III:	জলবায়ু , স্বাভবিক উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা		
	অধ্যায় - 4	জলবায়ু	৩৩
	অধ্যায় - 5	স্বাভবিক উদ্ভিদ	৫৭
	অধ্যায় - 6	মৃত্তিকা	৬৮
একক - IV:	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় : কারণ,প্রভাব ও ব্যবস্থাপনা		
	অধ্যায় - 7	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়	৭৭
পরিশিষ্ট :			৯৪
	I) রাজ্য, তাদের রাজধানী, জেলার সংখ্যা, আয়তন ও জনসংখ্যা		
	II) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, তাদের রাজধানী, আয়তন ও জনসংখ্যা		
	III) গুরুত্বপূর্ণ নদী অববাহিকা		
	IV) রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনুসারে অরণ্যাবৃত স্থান		
	V) ভারতের জাতীয় উদ্যানসমূহ		
শব্দকোশ :			৯৯

একক
1

ভূমিকা

এই এককের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল :

- অবস্থান- স্থানিক সম্পর্ক এবং পৃথিবীতে ভারতের স্থান

অধ্যায়

1

ভারত - অবস্থান

INDIA - LOCATION

পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে তোমরা নিশ্চয়ই ভারতের মানচিত্র দেখেছ। এখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভারতের মানচিত্রটি নিরীক্ষণ করো (চিত্র 1.1)। এবার দক্ষিণতম অক্ষরেখা থেকে উত্তরতম অক্ষরেখা এবং পশ্চিমতম দ্রাঘিমারেখা থেকে পূর্বতম দ্রাঘিমারেখা চিহ্নিত করো।

ভারতের মূল ভূখণ্ডটি উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সীমা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হয়ে উপকূল থেকে 12 নটিক্যাল মাইল (প্রায় 21.9 কিমি) পর্যন্ত বিস্তৃত। নীচে তা বিশদভাবে দেখানো হল।

স্টেটু (Statute) মাইল	=	63,360 ইঞ্চি
1 Nautieal নটিক্যাল মাইল	=	72,960 ইঞ্চি
1 স্টেটুট মাইল	=	প্রায় 1.6 কিমি (1.584কিমি)
1 নটিক্যাল মাইল	=	প্রায় 1.8 কিমি (1.852 কিমি)

ভারতের সর্ব দক্ষিণের অক্ষাংশগত সীমানা $6^0 45'$ উত্তর অক্ষাংশ, এটি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত। এসো, আমরা এখন অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার এই বিশাল ব্যাপ্তির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্ঠা করব।

তোমরা যদি ভারতের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার ব্যাপ্তির দিকে আলোকপাত কর তাহলে দেখতে পাবে যে, এই রেখাগুলো উভয় দিকে প্রায় 30° পর্যন্ত বিস্তৃত। উভয় দিকে পার্থক্য সমান হলেও দূরত্ব সমান নয় অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে মূল ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য 3,214 কিমি হলেও পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য 2,933 কিমি। তাহলে এই পার্থক্যের কারণ কী ? এই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা এবং সময় সম্পর্কে তোমাদের 'ব্যাবহারিক ভূগোল' বভাগ - I' (Practical Work in Geography,Part-I, NCERT-2006) বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই পার্থক্য মূলত দুটো দ্রাঘিমারেখার মধ্যে সর্বত্র সমদূরত্ব না থাকার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে দুটো দ্রাঘিমার মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। কিন্তু দুটো অক্ষরেখার মধ্যে দূরত্ব সর্বত্র সমান থাকলেও মেরুর দিকে অক্ষরেখার দৈঘ্য ক্রমশ ছোটো হতে থাকে। দুটো অক্ষরেখার মধ্যে দূরত্ব খুঁজে বের করো।

অক্ষরেখাগত মান অনুসারে, ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত ক্রান্তীয় মণ্ডলে অবস্থান করে, অপরদিকে উত্তর প্রান্ত উপক্রান্তীয় বা উষ্ণমণ্ডলে অবস্থান করে। এরূপ অবস্থানের জন্য ভারতের ভূগঠন, ভূমিরূপ, মাটির প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

এখন, আমরা ভারতের দ্রাঘিমাগত অবস্থান ও ভারতীয় জনগণের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করব। দ্রাঘিমাগত মান অনুসারে, ভারতে দ্রাঘিমারেখার প্রসার প্রায় 30° । ফলে সর্ব পূর্ব প্রান্ত থেকে সর্ব পশ্চিম প্রান্তের অঞ্চলসমূহের সময়ের পার্থক্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যুক্তিসঙ্গত ও সর্বজন স্বীকৃত মতামতের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সর্বাধিক $7^0 30'$ দ্রাঘিমাগত দূরত্বে একটি প্রমাণ দ্রাঘিমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা $82^\circ 30'$ পূর্ব দ্রাঘিমা নির্ধারিত হয়েছে। এই দ্রাঘিমা অনুসারে ভারতের প্রমাণ সময় স্থির করা হয়েছে। ভারতের প্রমাণ সময় গ্রিনিচ প্রমাণ সময় (GMT) অপেক্ষা পাঁচ ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট এগিয়ে রয়েছে। পূর্ব গোলার্ধে অবস্থানের জন্যই ভারতের প্রমাণ সময় এগিয়ে রয়েছে।

কিছু কিছু দেশ উত্তর-দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব -পশ্চিম দিকে বেশি প্রশস্ত। তাই সেসকল দেশে একাধিক প্রমাণ দ্রাঘিমা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সাতটি সময় বলয় রয়েছে।

চিত্র 1.1: ভারত : প্রশাসনিক বিভাগ

দ্রষ্টব্য: 2014 সালের জুন মাসে তেলেঙ্গানা ভারতের 29 তম রাজ্যের স্বীকৃতি পায়।

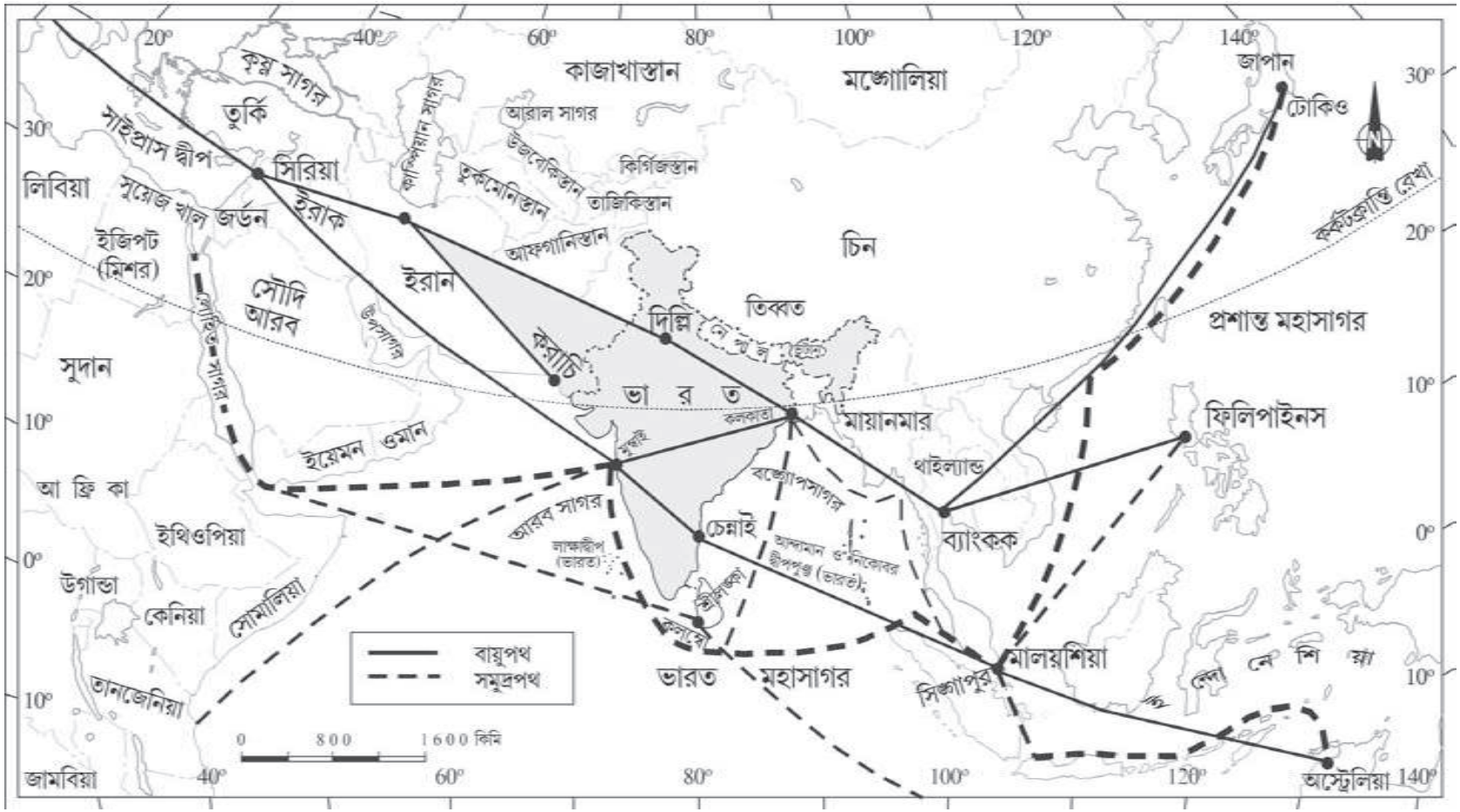

চিত্র 1.2 : পৃথিবীর পূর্বাংশে ভারতের অবস্থান

হয় প্রায় দুই ঘণ্টার (প্রতি 15° দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের পার্থক্য এক ঘণ্টা। তোমরা সবাই ভারতের প্রমাণ সময় (Indian Standard Time,IST) -এর সাথে পরিচিত। প্রমাণ দ্রাঘিমা (Standard Meridian)-র ব্যবহার কী? পশ্চিম দিকে অবস্থিত জয়শলমীর অপেক্ষা পূর্ব দিকে অবস্থিত রাজ্যসমূহে প্রায় দুই ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হয়। তা সত্ত্বেও পূর্ব দিকে অবস্থিত ডিব্রুগড়, ইম্ফল এবং পশ্চিমের জয়শলমীর বা দক্ষিণের চেন্নাই বা মধ্যভাগের ভূপালসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘড়িতে একই সময় নির্দেশ করে। কেন এরূপ হয় ? ভারতের যে সকল অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রমাণ দ্রাঘিমা অতিক্রম করেছে তাদের নাম লেখো।

ভারতের আয়তন 3.28 মিলিয়ন বর্গ কিমি যা পৃথিবীর মোট স্থলসীমার 2.4 শতাংশ অধিকার করে রয়েছে। আয়তনে ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। ভারত ছাড়া আয়তনে বড়ো দেশগুলোর নাম খুঁজে বের করো।

আয়তন (Size) :

বিশাল আকৃতির এই ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তাই তোমরা উত্তরে বিশাল ও দুর্গম পর্বতশ্রেণি যেমন দেখতে পাবে, তেমনি দীর্ঘতম নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, প্রভৃতিও দেখতে পাবে। আবার উত্তর -পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে রয়েছে ঘন সবুজ পার্বত্য অরণ্যানি, রয়েছে বিশাল বালুকাময় মরুস্থলী। তোমরা আরও লক্ষ করবে যে, উত্তর সীমান্তে রয়েছে নবীন ভঙ্গিল পর্বত হিমালয় পর্বতমালা, উত্তর -পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণি, উত্তর-পূর্বে রয়েছে পূর্বাচল পাহাড় এবং দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগর। ভূ-প্রকৃতিগত এই বৈচিত্র্যের জন্য ভারতকে উপমহাদেশও বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হল- পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং ভারত। অতীতে হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতশ্রেণি মিলিতভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করত। শুধুমাত্র কয়েকটি গিরিপথ, যেমন- খাইবার, বোলান, সিপকিলা, নাথুলা, বোমডিলা, প্রভৃতি গিরিপথের মাধ্যমেই যাতায়াত ব্যবস্থা সচল ছিল। তবে এই পথ ছিল খুবই দুর্গম ও বন্ধুর। এরূপ অবস্থান ভারত উপমহাদেশকে একটি বিশেষ আঞ্চলিক গুরুত্ব দিয়েছে।

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র অনুসারে তোমরা যখন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বা রাজস্থানের জয়শলমীর থেকে মণিপুরের ইম্ফল ভ্রমণ করবে তখন তোমরা সেসকল স্থানের ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলো অনায়াসে বর্ণনা করতে পারবে।

ভারতের উপদ্বীপীয় অংশটি ক্রমশ ভারত মহাসাগরের দিকে প্রসারিত রয়েছে। ভারতের মূল ভূখণ্ডে উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য 6,100 কিমি হলেও সমগ্র ভারতে উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য 7,517 কিমি। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আরব সাগরে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপ এর অন্তর্গত। এজন্য ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ।

মনে রেখো

স্কুল ভুবন একটি পোর্টাল যা মানচিত্র ভিত্তিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশরে প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও সুস্থির উন্নয়নে এইসবের ভূমিকা ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করে। এটা এন সি ই আর টি সিলেবাস ভিত্তিক ভুবন এন আর এস সি / ইসরোর একটা উদ্যোগ। তোমরা এই প্রকল্পে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ম্যাপ/মানচিত্র দেখতে পাবে।
http: // bhuvan - noeda.nrsc.gov.in/ projects/ school bhuvan

ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহ (India and its Neighbours) :

মানচিত্রে ভারতের অবস্থান দেখো (চিত্র 1.2)। তোমরা লক্ষ করবে যে, ভারতের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ মধ্যভাগে। ভারতের দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগর ও তার দুটি শাখা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর । এই উপদ্বীপীয় অবস্থানের জন্য ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সমুদ্রপথে এবং আকাশপথে সংযোগ রক্ষা করে।

মানচিত্র অনুশীলনের মাধ্যমে ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

দক্ষিণদিকে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দুটি প্রতিবেশী দেশ হল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। মান্নার উপসাগর ও পক্ প্রণালী শ্রীলঙ্কাকে ভারতথেকে বিছিন্ন করেছে।

উপসাগর ও প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য দেখাও

বর্তমানে এই সকল প্রাকৃতিক বাধাসমূহ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে কি তোমরা মনে কর ? কীভাবে আমরা এই সকল কঠিনতা অতিক্রম করব তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাও।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করে লেখো:

ক) নিম্নে প্রদত্ত অক্ষাংশগত বিস্তারের মধ্যে কোন্‌টি ভারতের অবস্থান?

অ) 8°41 উ-35° 7 উ, আ) 8°4´ উ- 35°6´ উ

ই) 8°4´ উ-35°6´ উ ঈ) 6°45´ উ-37°6´ উ

খ) নিম্নে প্রদত্ত দেশগুলোর মধ্যে কোন্ দেশের সাথে ভারতের সর্বাধিক স্থলসীমান্ত রয়েছে?

অ) বাংলাদেশ আ) পাকিস্তান

ই) চিন ঈ) মায়ানমার

গ) নিম্নের কোন্ দেশটি ভারত অপেক্ষা বড়ো ?

অ) চিন আ) ফ্রান্স

ই) মিশর ঈ) ইরান

ঘ) নিম্নের কোন্‌টি ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা?

অ) 69°30´ পূ আ) 82°30´ পূ

ই) 75°30´ পূ ঈ) 90°30´ পূ

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (30 টি শব্দের মধ্যে)

ক) ভারতে কি একাধিক প্রমাণ দ্রাঘিমার প্রয়োজন রয়েছে? যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে তোমরা এরূপ মনে কর কেন ?

খ) ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখার কীরূপ প্রভাব রয়েছে?

গ) ভারতের অক্ষরেখার বিস্তৃতি ভারতকে কী সুবিধা দিয়েছে?

ঘ) যেহেতু পূর্বদিকে আগে সূর্যোদয় হয়, তাই নাগাল্যান্ডে আগে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। তাহলে কোহিমা ও দিল্লির ঘড়িতে একই সময় নির্দেশ করে কেন ?

প্রকল্প ও কার্যকলাপ

পরিশিষ্ট-I অনুসারে কর্ম পরিকল্পনা (সংশ্লিষ্ট শিক্ষক -শিক্ষিকা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে সাহায্য করবেন)

ক) লেখচিত্রের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মেঘালয়, গোয়া, কেরালা, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের জেলার সংখ্যা লিপিবদ্ধ করো। কোনো রাজ্যের আয়তনের সাথে সে রাজ্যের জেলার সম্পর্ক আছে কি?

খ) উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচলপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা , রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যসমূহের মধ্যে কোন্ রাজ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যা দেখা যায় এবং কোন্ রাজ্যে সর্বনিম্ন জনঘনত্ব দেখা যায়?

গ) কোনো রাজ্যের আয়তন ও জেলার মধ্যে সম্পর্ক নিরপণ করো।

ঘ) উপকূল সীমারেখাযুক্ত রাজ্যগুলোর নাম লেখো।

ঙ) পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে শুধুমাত্র স্থলসীমা দ্বারা যুক্ত রাজ্যগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজাও ।

পরিশিষ্ট-II অনুসারে কর্ম পরিকল্পনা

ক) যেসকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল উপকূলবর্তী অবস্থানে রয়েছে তাদের নাম লেখো।

খ) দিল্লি (NCR) এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ও জনসংখ্যার পার্থক্য তোমরা কীভাবে বর্ণনা করবে?

গ) স্তম্ভ লেখচিত্রের (Bar Diagram) মাধ্যমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের আয়তন ও জনসংখ্যা দেখাও ।

একক
II

ভূ-প্রকৃতি

এই এককের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল:

- **গঠন ও ভূ-প্রকৃতি : ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগসমূহ**
- **জলনির্গমণ প্রণালী- হিমালয় ও উপদ্বীপীয় অংশের জলনির্গমণ সংক্রান্ত ধারণা**

অধ্যায়

2

গঠন ও ভূপ্রকৃতি
Structure and Physiography

আমাদের এই পৃথিবীর সুন্দর একটা ইতিহাস রয়েছে, তা কি তোমরা জান? বর্তমানে আমরা যে পৃথিবী ও তার বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি দেখতে পাচ্ছি তা অনেক বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে গঠিত হয়েছে। আধুনিক তথ্য প্রমাণ অনুসারে পৃথিবীর বয়স প্রায় 400 মিলিয়ন বছর। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন অন্তর্জাত ও বহির্জাত বল বা শক্তির (endogenic and exogenic forces) ফলে পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর বর্তমান রূপটি গঠিত হয়েছে। এই উভয়মুখী বল ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে বিভিন্ন আকৃতির ভূমিরূপ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে তোমরা পাতসংস্থান তত্ত্ব সম্পর্কে পড়েছ। পৃথিবীর পাতসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়টি তোমরা 'প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব',এন সি ই আর টি, 2006 (*Fundamentals of Physical Geography* NCERT, 2006) বই থেকে বিশদভাবে জানতে পারবে। কোটি কোটি বছর পূর্বে ভারতীয় পাতটি নিরক্ষরেখার দক্ষিণে ছিল, তা কি তোমরা জান ? তোমরা কি জান যে, ভারতীয় পাতটি আয়তনে বড়ো ছিল এবং অস্ট্রেলীয় পাতটি এটির অংশবিশেষ ছিল? কোটি কোটি বছর পূর্বে ভারতীয় পাতটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। অস্ট্রেলীয় পাতটি তখন বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে গেছে আর ভারতীয় পাতটি উত্তরে সরে গেছে। ভারতীয় পাতের বিভিন্ন অংশ কি তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে? উত্তরমুখী সঞ্চরণের ফলে ভারতীয় পাতের গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে এর প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। ভারতীয় পাতের উত্তরমুখী সঞ্চরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে কি বলতে পারো?

প্রাথমিকভাবে অন্তর্জাত ও বহির্জাত বল এবং পাতসমূহের পার্শ্বিক সঞ্চরণের ফলে ভারতের বর্তমান ভূ-প্রাকৃতিক সংগঠনে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভূতত্ত্বগত গঠন ভারত উপমহাদেশে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ভূতাত্ত্বিক গঠন ও প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ভারতকে তিনটি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। এই ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলো হল :

i) উপদ্বীপীয় অংশ (The Peninsular Block)
ii) হিমালয় ও উপদ্বীপীয় উচ্চভূমি (The Himalayas and other Peninuslar Mountains)
iii) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি (Indo-Ganga-Brahmaputra Plain)

i) উপদ্বীপীয় অংশ (The Peninular Block)

উপদ্বীপীয় অংশের উত্তর পার্শ্বের সীমানা কচ্ছের রণ থেকে দিল্লির নিকট আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম পার্শ্ব পর্যন্ত একটি অসমান রেখার মতো বিস্তৃত। এরপর রাজমহল পাহাড়ের কাছে গঙ্গা ও যমুনা নদী কিছুটা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও দক্ষিণে কাবেরী নদী অববাহিকা অঞ্চল, উত্তর-পূর্বে মেঘালয় মালভূমি এবং পশ্চিমে রাজস্থান পর্যন্ত এই উপদ্বীপীয় অংশ বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব অংশটি পশ্চিমবঙ্গের মালদা চ্যুতি দ্বারা ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই অংশের অন্তর্গত রাজস্থানে রয়েছে মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চল।

এই উপদ্বীপীয় অংশটির অধিকাংশই প্রাচীন নিস্ ও গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত। ক্যামব্রিয়ান যুগ থেকে এটি কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত। তবে পশ্চিম উপকূলীয় সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত থাকায় সেখানে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেলেও এবং পাত সঞ্চরণের ফলে কিছু পরিবর্তন হলেও মূল বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রয়েছে, ইন্দো-অস্ট্রেলীয় পাতের উল্লম্ব সঞ্চরণের ফলে স্তূপ পর্বত ও চ্যুতি

সৃষ্টি হয়েছে। নর্মদা, তাপ্তী ও মহানদী নদীর গ্রস্ত উপত্যকা, সাতপুরা পর্বত প্রভৃতি এর উদাহরণ। আরাবল্লি পর্বত, নাল্লামালা পর্বত, জাভাদি পর্বত, ভেলিকোন্ডা পর্বত, পালকোন্ডা পর্বতশ্রেণি, মহেন্দ্রগিরি পর্বতশ্রেণি প্রভৃতি উপদ্বীপীয় অংশের অর্ন্তভূক্ত । এখানকার নদী উপত্যকা অগভীর ও নিম্ন ঢালযুক্ত।

তোমরা 'ব্যবহারিক ভূগোল, ভাগ-1' (*Practical Work in Geography, Part-I,* NCERT- 2006) থেকে ভূমির ঢাল কীভাবে বের করতে হয় তা জেনেছ। এখন হিমালয় ও উপদ্বীয় অঞ্চল থেকে প্রবাহিত নদীগুলোর ঢাল নির্ণয় করতে এবং তাদের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে কি ?

অধিকাংশ পূর্ববাহিনী নদী বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পূর্বে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ii) হিমালয় ও উপদ্বীপীয় উচ্চভূমি
(The Himalayas and other Peninuslar Mountains)

হিমালয়ের পর্বতসমূহ উপদ্বীপীয় উচ্চভূমির তুলনায় নবীন, কোমল, এবং নমনীয়। অপরদিকে ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী উপদ্বীপীয় উচ্চভূমি প্রাচীন, সুস্থিত ও অনমনীয়। অতএব ভূমিরূপ গঠনে অন্তর্জাত ও বহির্জাত বল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলস্বরূপ চ্যুতি, ভাঁজ ও সমতলভূমির সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চভূমি থেকে নদী সমূহের উৎপত্তি হয় বলে এই প্রবাহকে উচ্চ প্রবাহ বা নদীর যৌবন পর্যায়

চিত্র 2.1 : গিরিখাত

বলে। এই প্রবাহপথে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ যেমন **গিরিখাত, 'V' আকৃতির উপত্যকা, র‍্যাপিড ও কাসকেট, জলপ্রপাত** ইত্যাদির ভূমিরূপ গঠন করে।

iii) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি
(Indo-Ganga-Brahmaputra Plain)

ভূতাত্ত্বিক গঠনের এই তৃতীয় বিভাগটি হল সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমতলভূমি। এটি প্রায় 64 মিলিয়ন বছর পূর্বে মহীখাত অংশে হিমালয় পর্বতের অবনমনের ফলে গঠিত হয়েছে। সেইসময় থেকে উপদ্বীয় অংশের নদীবাহিত সঞ্চিত পলি দ্বারা পর্যায়ক্রমে এই সমভূমি গঠিত হয়েছে।এই সমভূমি অঞ্চলে পলির গভীরতা গড়ে 1000 -2000 মিটার।

এই সকল তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, অঞ্চলভেদে ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন বৈচিত্র্যময় এবং অন্যান্যক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপ অন্যতম। ভারতের উপমহাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপে ভারতের ভূতাত্ত্বিক ও ভূমিরূপ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ভূ-প্রকৃতি (Physiography)

'ভূ-প্রকৃতি' বলতে কোনো অঞ্চলের গঠনপ্রক্রিয়া ও ভূমির উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়কে বোঝায়। ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য হল ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য । উত্তরে রয়েছে বিস্তীর্ণ বন্ধুর পার্বত্যভূমি ও তাদের উচ্চতম শৃঙ্গ, সুদৃশ্য উপত্যকা এবং সংকীর্ণ গভীর গিরিখাত। দক্ষিণে রয়েছে সুস্থিত সমতলপৃষ্ঠবিশিষ্ট মালভূমি, ক্ষয়িত শিলা ও উন্নত পর্বত ঢাল। এই দু'ধরনের ভূমিরূপের মাঝে রয়েছে **উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি।**

ভূমিরূপের এই তারতম্যের ভিত্তিতে ভারতকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

1) উত্তর ও উত্তর - পূর্বের পর্বতসমূহ
2) উত্তরের বিশাল সমভূমি
3) উপদ্বীপীয় মালভূমি
4) ভারতের মরুঅঞ্চল
5) উপকূলীয় সমভূমি এবং
6) দ্বীপপুঞ্জ সমূহ

1) উত্তর ও উত্তর - পূর্বের পর্বতসমূহ
(The North-and North Eastern Mountains)

হিমালয় ও উত্তর - পূর্বের পর্বতসমূহ এর অন্তর্গত। কতগুলো সমান্তরাল পর্বতশ্রেণি দ্বারা হিমালয় গঠিত। এর গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশ্রেণি

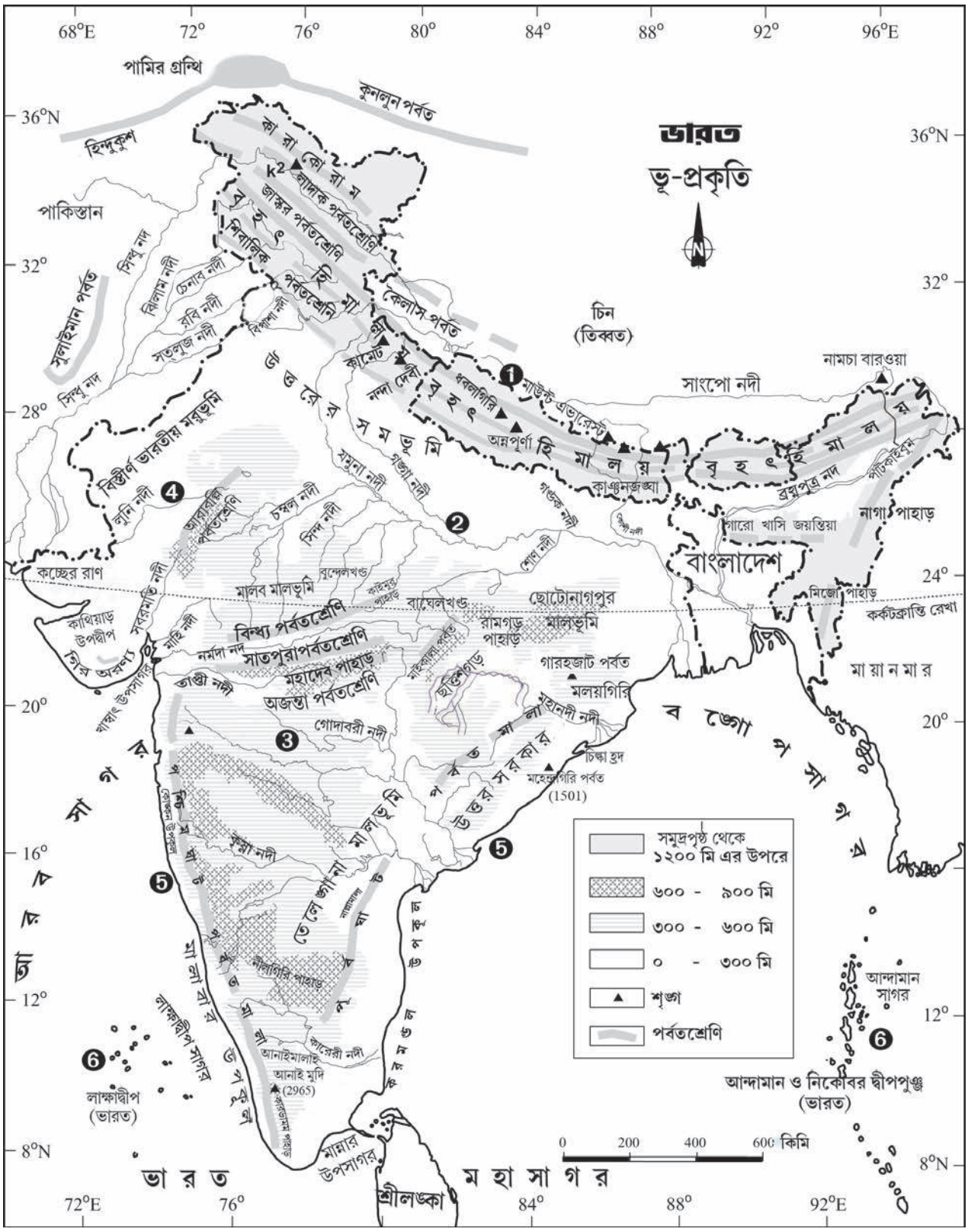

চিত্র 2.2: ভারত : প্রাকৃতিক বিভাগ

বৃহৎ হিমালয় ও শিবালিক হিমালয়ের অন্তর্গত (চিত্র 2.2) । ভারতের উত্তর - পশ্চিম দিকে এই পর্বতশ্রেণি উত্তর - পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রসারিত। দার্জিলিং ও সিকিম অংশে হিমালয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত। অরুণাচলপ্রদেশে এর প্রসার দক্ষিণ - পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরাম রাজ্যে এটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পূর্ব থেকে পশ্চিমে হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় 2500 কিমি। এটি মধ্য অক্ষাংশীয় পর্বতমালা (Central arial range) নামেও পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি 160-400 কিমির মধ্যে থাকে। মানচিত্র দেখে বোঝা যায় যে, হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তরে প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান থাকায় ভারত মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে পৃথক হয়েছে।

চিত্র 2.3 : হিমালয় পর্বতমালা

হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে শুধুমাত্র বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেনি, এটি জলবায়ু, নদনদী এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয় তা কি তোমরা খুঁজে বের করতে পারবে ? পৃথিবীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি উপাদানের নাম খুঁজে বের করতে পারবে কি ?

হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপক ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভূ -প্রকৃতি, পর্বতসমূহের উচ্চতা ও অন্যান্য ভূ-প্রাকৃতিক উপাদানের ভিত্তিতে হিমালয়কে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়-

i) কাশ্মীর বা উত্তর-পশ্চিম হিমালয়
ii) হিমালয় ও উত্তরাঞ্চল হিমালয়
iii) দার্জিলিং ও সিকিম হিমালয়
iv) অরুণাচল হিমালয়
v) পূর্বের পাহাড় ও পর্বতসমূহ

কাশ্মীর বা উত্তর-পশ্চিম হিমালয় (Kashmir or Northwestern Himalayas)

কারেওয়া
কারেওয়া হল হিমবাহ বাহিত ও অন্যান্য খনিজ সমৃদ্ধ উর্বর মাটি।

হিমালয়ের এই অংশে রয়েছে কারাকোরাম, লাডাক, জাস্কর, পিরপঞ্জাল প্রভৃতি পর্বতশ্রেণি। কাশ্মীর হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব রয়েছে ভারতের একমাত্র শীতল মরুভূমি লাডাক (4, 878 মি.), এটি বৃহৎ হিমালয় এবং কারাকোরামের মধ্যভাগে অবস্থিত। বৃহৎ হিমালয় ও পিরপঞ্জালের মধ্যভাগে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যকা ও ডাল হ্রদ। দক্ষিণ এশিয়ার বিখ্যাত হিমবাহ **বালাতোরা ও সিয়াচেন (ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ)** হিমবাহ এই কাশ্মীর হিমালয়ে রয়েছে। কারেওয়া (Karewa) সঞ্চয়ের ফলে কাশ্মীর হিমালয়ে বিভিন্ন ধরনের জাফরাণ উৎপন্ন হয় যা স্যাফ্রণ-এর স্থানীয় প্রকার বিশেষ। বিখ্যাত গিরিপথ জোজিলা বৃহৎ হিমালয়ে অবস্থিত। অপর গিরিপথগুলো হল পিরপঞ্জলের বানিহাল, জাস্কর পর্বতের ফুটো লা এবং লাডাক পর্বতের খরদুং লা (' লা' শব্দের অর্থ গিরিপথ)। এই অঞ্চলের কয়েকটি স্বাদু জলের হ্রদ হল **ডাল, উলার** এবং নোনা জলের হ্রদ **প্যাংগ্যাং সু (ভারতের উচ্চতম লবণাক্ত হ্রদ)** ও **সু-মেরিরি**। কাশ্মীর উপত্যকা সিন্ধু ও তার উপনদী বিতস্তা (Jhelem) ও চন্দ্রভাগা (Chenab) নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম হিমালয় চিত্তাকর্ষক দৃশ্য এবং চিত্রপটের ন্যায় ভূমিরূপের জন্য বিশেষ খ্যাত। হিমালয়ের এই বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপই হিমালয় অভিযাত্রীদের প্রধান আকর্ষণ। তোমরা কি জান যে, বৈষ্ণোদেবী মন্দির, অমরনাথ গুহা, চরার-এ-শরীফ প্রভৃতি তীর্থভূমি এখানে রয়েছে এবং প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী এসকল স্থানে আসেন ?

চিত্র 2.4 : বিতস্তা নদীর মিয়েন্ডার

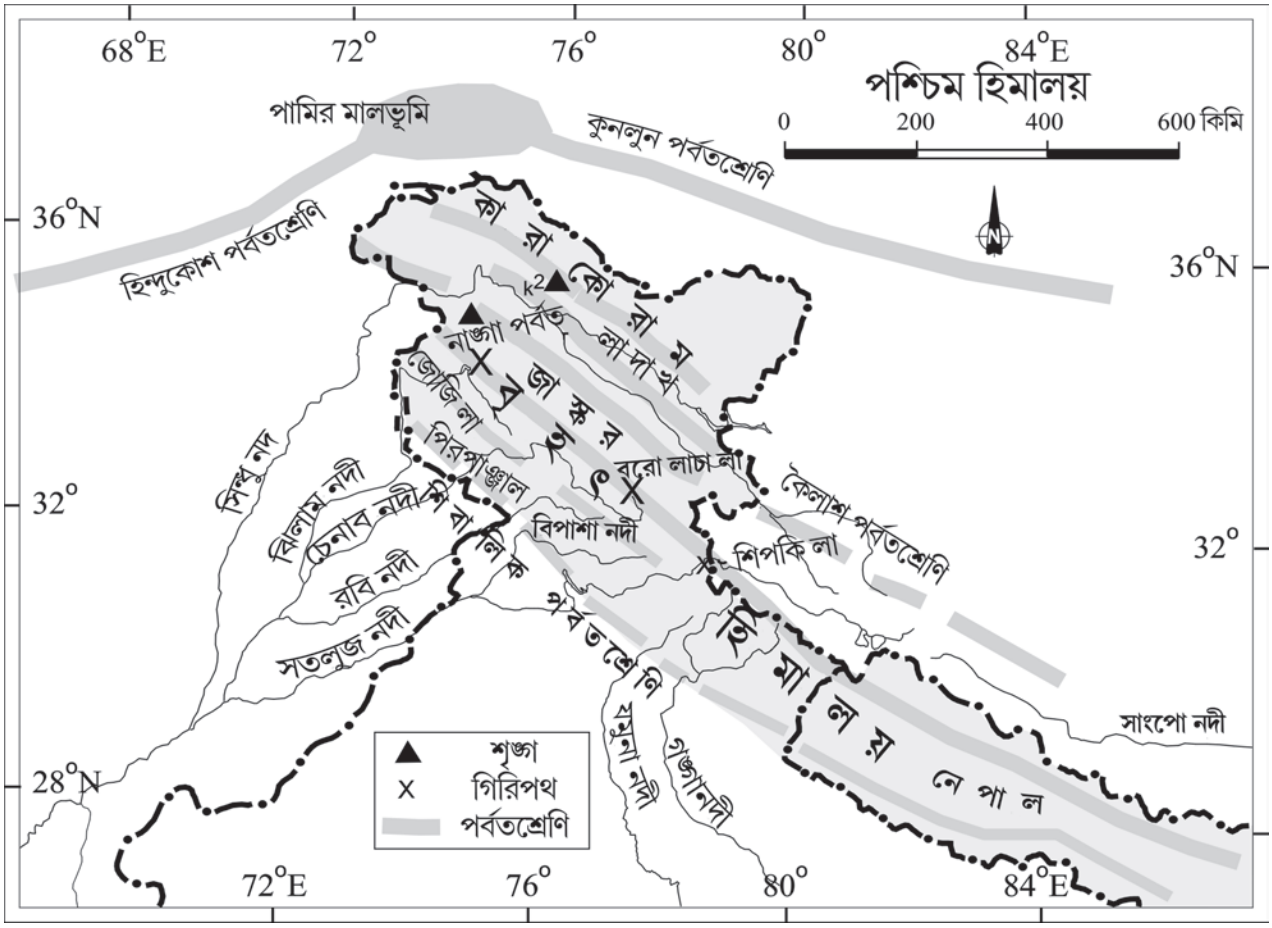

চিত্র 2.5 :পশ্চিম হিমালয়

মজাদার বিষয়

কাশ্মীর উপত্যকার বিতস্তা নদীতে মিয়ান্ডার সৃষ্টির কারণ হিসেবে বলা হয় যে, পূর্বে এখানে বিশালাকার হ্রদ ছিল যার কিয়দংশ বর্তমানে ডাল হ্রদ নামে পরিচিত।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। ডাল হ্রদ শ্রীনগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কাশ্মীর উপত্যকায় বিতস্তা নদী যৌবন অবস্থায় থাকে। তবে কখনো-কখনো নদীর পরিণত পর্যায়ের ভূমিরূপ **'মিয়ান্ডার'** গঠন করে। পরিণত অবস্থায় এই প্রকার ভূমিরূপ নদী সৃষ্ট ভূমিরূপের বিবর্তনের ফলে গঠিত হয় (চিত্র 2.4)। নদীর পরিণত পর্যায়ের কয়েকটি ভূমিরূপের নাম বলতে পারো কি ?

কাশ্মীর হিমালয়ের সর্বদক্ষিণের অনুদৈর্ঘ্য উপত্যকা 'দুন' নামে পরিচিত। যেমন, জম্মু দুন, পাঠানকোট দুন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ii) হিমাচল ও উত্তরাঞ্চল হিমালয়

উত্তরের পার্বত্যভূমির এই অংশ পশ্চিমে ইরাবতী নদী এবং পূর্বে ঘর্ঘরার উপনদী কালী নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত। ভারতের দুটো প্রধান নদী যথা- গঙ্গা ও সিন্ধু নদ এই অংশে রয়েছে। সিন্ধুর প্রধান তিনটি উপনদী শতদ্রু (Sattuy), বিপাশা(Beas), ইরাবতী (Rave) এবং গঙ্গার প্রধান উপনদী যমুনা ও ঘর্ঘরা এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। হিমাচল হিমালয়ের সর্ব উত্তরের অংশ শীতল মরুভূমি লাডাক পর্যন্ত প্রসারিত। লাডাক মরুভূমিটি লাহুল ও স্পিতি জেলার স্পিতি মহকুমাতে অবস্থিত। হিমালয় পর্বতমালার তিনটি প্রধান পর্বতশ্রেণি এই অংশে সুস্পষ্টরূপে বিরাজমান। এগুলো হল বৃহৎ হিমালয়, অবহিমালয় (অবহিমালয় স্থানীয়ভাবে হিমাচল প্রদেশের ধওলাধর এবং উত্তরাঞ্চলে নাগটিব্বা নামে পরিচিত) এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত শিবালিক পর্বতশ্রেণি। অবহিমালয়ের উচ্চতা 1000-2000 মি. হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু দ্বারা ব্রিটিশ শাসকগণও আকর্ষিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ ধরমশালা, মুসৌরী,

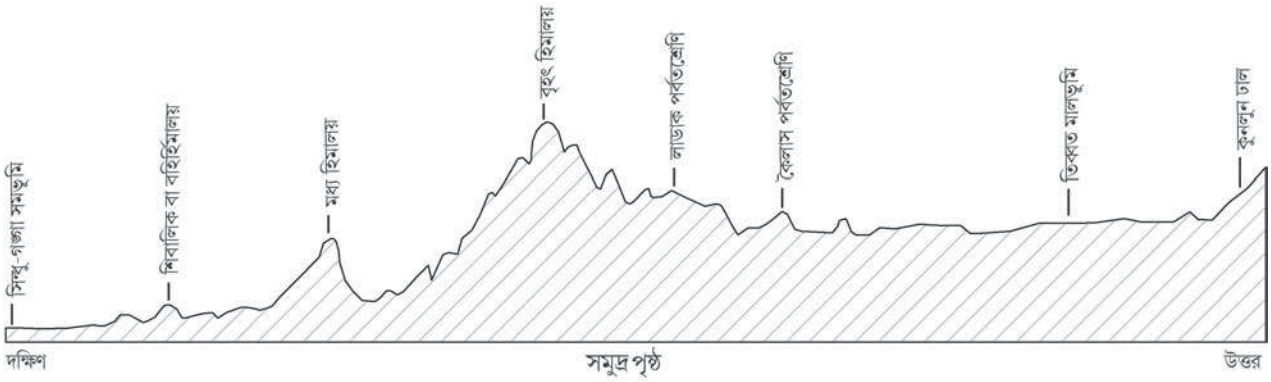

চিত্র 2.6 : হিমালয় পর্বতশ্রেণি : দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রদর্শিত প্রস্থচ্ছেদ

'শিবালিক' শব্দটির উৎপত্তি ভূতাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দেরাদুনের নিকটে অবস্থিত একটি অঞ্চল 'শিবাওয়ালা'-র সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোনো একসময়ে সার্বভৌম জরিপ (Imperial Survey)-এর মুখ্যকেন্দ্র ছিল এবং পরবর্তী সময়ে দেরাদুনের স্থায়ী মুখ্য কার্যালয় হিসেবে গড়ে উঠে।

সিমলা, কৌশানী, ক্যান্টমেন্ট টাউন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শৈলশহর গড়ে ওঠেছিল। এছাড়া সিমলা, মুসৌরী, কাসৌলী, আলমোরা, লেন্সডাউন, রানিখেত প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসও সেই অঞ্চলে গড়ে ওঠে।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই অঞ্চলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ হল 'শিবালিক' এবং 'দুন গঠন'। এই অঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুন হল- চণ্ডীগড়-কালকা দুন, নালগড় দুন, দেরাদুন,হরকা দুন,কোটা দুন প্রভৃতি। এসকল দুনের মধ্যে বৃহত্তম দুন হল দেরাদুন। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 35-45 কিমি এবং প্রস্থ প্রায় 22-25 কিমি। বৃহৎ হিমালয়ের উপত্যকাসমূহে অধিকাংশ 'ভুটিয়া'-দের বসবাস। 'ভুটিয়া'-রা সাধারণ যাযাবর শ্রেণি। তারা বুগেইলস (উচ্চ অক্ষাংশের গ্রীষ্মকালীন তৃণভূমি) থেকে গ্রীষ্মকালে প্রব্রজন করে এবং শীতকালে উপত্যকায় ফিরে যায়। বিখ্যাত **ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার** (Valley of Flower) এই অঞ্চলে রয়েছে। **হিন্দুদের পবিত্র তীর্থভূমি** গঙ্গোত্রী, যমুনাত্রি, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, হেমকুণ্ড সাহব প্রভৃতিও এই অঞ্চলে রয়েছে। বিখ্যাত পাঁচটি প্রয়াগও (নদীর সংগমস্থল) এই অংশে রয়েছে। তোমাদের পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত। তোমরা কি দেশের অন্য অংশের বিখ্যাত প্রয়াগসমূহের নাম বলতে পারো ?

iii) দার্জিলিং ও সিকিম হিমালয়

হিমালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে নেপাল হিমালয় এবং পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে ভুটান হিমালয়, এই অংশটি আয়তনে ছোটো হলেও এটি হিমালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্রোতস্বিনী তিস্তা, উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা (কাঞ্চনগিরি), গভীর উপত্যকা প্রভৃতি এই অংশে রয়েছে। এই অঞ্চলের উত্তরাংশের উচ্চভূমিতে '**লেপচা**' নামক উপজাতির বাস। অপরদিকে দক্ষিণে দার্জিলিঙ হিমালয়ে নেপালি, বাঙালি, মধ্যভারতের উপজাতিসহ মিশ্রবসতি লক্ষ করা যায়। ভূমির ঢাল, জৈব উপাদানসমৃদ্ধ উর্বর মাটি বর্ষব্যাপী বৃষ্টিরপাতের সমবণ্টন, মৃদু শীতকাল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সুবিধার জন্য ব্রিটিশরা এখানে চা বাগিচা গড়ে তুলেছিল। হিমালয়ের অন্যান্য অংশের তুলনায় অরুণাচল হিমালয়সহ এই অংশে শিবালিক গঠনের অনুপস্থিতি সুস্পষ্ট, তাই এই অংশে শিবালিক গঠনের তুলনায় '**দুয়ার গঠন** (Duar formation)' প্রসিদ্ধ এবং এই দুয়ার-ই চা চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দার্জিলিং ও সিকিম হিমালয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং বাহারি উদ্ভিদ ও প্রাণীর (Flora and Fauna) জন্য বিখ্যাত। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড, যা দার্জিলিং ও সিকিম হিমালয়কে বিশেষিত করেছে।

iv) অরুণাচল হিমালয়

এই পর্বতশ্রেণি পূর্বদিক ভুটান হিমালয় থেকে প্রসারিত হয়ে দিফু গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত । এটি অরুণাচল হিমালয় নামে পরিচিত। এই পর্বতশ্রেণি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশৃঙ্গ হল কাঙ্গাটু, নামচা বারওয়া প্রভৃতি। উত্তর থেকে দক্ষিণে পরিবাহিত স্রোতস্বিনী নদী, গভীর গিরিখাত

প্রভৃতি দ্বারা এই পর্বতশ্রেণি ব্যবচ্ছিন্ন । নামচা বারওয়া পর্বতমালা অতিক্রম করে গভীর গিরিখাত গঠন করে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হল কামেঙ, সুবর্ণসিঁড়ি, দিহং, দিবং, লোহিত প্রভৃতি নদী। এই নদীগুলো নিত্যবহ এবং প্রবাহপথে প্রচুর জলপ্রপাত সৃষ্টি করে। ফলে এখানে দেশের প্রধান প্রধান জলবিদ্যুত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। অরুণাচল হিমালয়ের অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে বসবাসকারী কয়েকটি উপজাতি জনগোষ্ঠী হল মোনপা, অবর, মিশমি, নাইসি, নাগা প্রভৃতি।

তাদের প্রধান জীবিকা হল **জুমচাষ**। এটি **স্থানান্তর কৃষি** নামেও পরিচিত। এই কৃষি পদ্ধতিতে জমির ঘাস লতাপাতা পুড়িয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। এই অঞ্চল জৈববৈচিত্র্যে ভরপুর। দেশের আদিম জনজাতি এই জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে। অসমতল ও বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে অত্যল্প অন্ত: উপত্যকাই একমাত্র পরিবহণ মাধ্যম। তা সত্বেও অরুণাচল-আসাম সীমান্তে 'দোয়ার' অঞ্চলের মাধ্যমেই যাতায়াত সম্পন্ন হয়।

Figure 2.7 : Eastern Himalayas

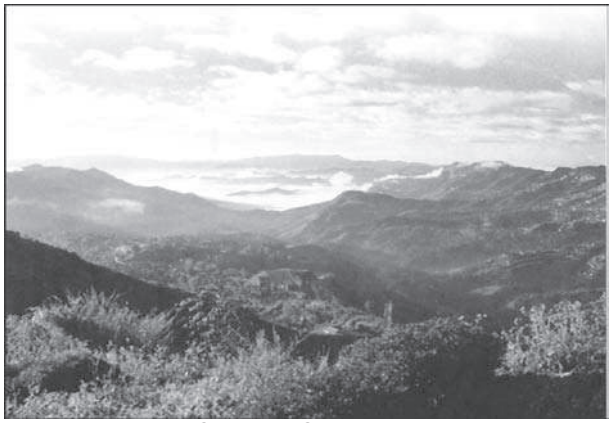

চিত্র 2.8 : মিজো পাহাড়

v) পূর্বের পাহাড় ও পর্বতসমূহ
(The Eastern Hills and Mountains)

হিমালয় পর্বতমালার এই অংশ সাধারণত উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। উত্তরে ইহা পাটকই পাহাড়, নাগাপাহাড়, মণিপুর পাহাড় এবং মিজো বা লুসাই পাহাড় নামে পরিচিত।

চিত্র 2.9 : লোকতাক হ্রদ

এই পাহাড়গুলোর উচ্চতা কম। এখানে অধিকাংশ উপজাতিদের বাস এবং তাদের প্রধান জীবিকা **'জুমচাষ'** । এখানকার অধিকাংশ পাহাড়গুলো ছোটো ছোটো নদী দ্বারা পরস্পর হতে পৃথক। মণিপুর ও মিজোরামের প্রধান নদী হল বরাক। বিশালকৃতি **'লোকতাক হ্রদ'** মণিপুরের ভূ-প্রকৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। লোকতাক হ্রদটি চারদিকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত (চিত্র 2.9)। মিজোরাম **'মোলাসিস'** অববাহিকা (Molassis Basin) নামেও পরিচিতি, মোলাসিস অববাহিকা মূলত কোমল ও অসংগত সঞ্চয়ের ফলে গঠিত। ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ উপনদী নাগাল্যান্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত। মণিপুর ও মিজোরামের দুটো নদী বরাক নদীর সাথে মিশেছে যা পরে মেঘনার উপনদীতে পরিণত হয়েছে। মণিপুরের পূর্বাংশে রয়েছে চিন্দুইনের উপনদী, এটি পরবর্তী সময়ে মায়ানমারের ইরাবতী নদীর উপনদীতে পরিবর্তিত হয়।

2) উত্তরের সমভূমি
(The Northern Plains)

সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলি দ্বারা উত্তরের সমভূমি গঠিত হয়েছে। এই সমভূমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় 3200 কিমি দীর্ঘ এবং স্থানভেদে 150-300 কিমি প্রশস্ত, পলির সর্বাধিক গভীরতা 1000-2000 মিটার। এই সমভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ভাবর, তরাই, পললভূমি – এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই পললভূমিকে পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা: খাদর ও ভাঙ্গার।

নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত সংকীর্ণ উপত্যকা **ভাবর** নামে পরিচিত। এটি শিবালিকের পাদদেশের ঢালু অংশের সাথে 8 থেকে 10 কিমি পর্যন্ত সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। এরফলে পর্বত শিখর থেকে উৎপন্ন নদী ও জলধারা নুড়ি, পাথর ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বহন করে আনে এবং এই অংশে সঞ্চয় করে। ভাবরের দক্ষিণে এবং গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে **তরাই অঞ্চল**, এটি 10-20 কিমি প্রশস্ত। তরাই (কথাটির অর্থ আর্দ্র অঞ্চল) হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে 38 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত আর্দ্র জলাভূমিময় তৃণভূমি নদীবাহিত নুড়ি, কাঁকড় দ্বারা গঠিত। অসংখ্য নদীখাত তরাই অঞ্চলটিকে বিভিন্ন সমান্তরাল অংশে ভাগ করেছে। এখানে লম্বা ঘাসের তৃণভূমি, চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বনভূমি, সাভানা বনভূমি প্রভৃতি দেখা যায়। এই বনভূমি অসংখ্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল।

চিত্র 2.10 : উত্তরের সমভূমি

তরাই-এর দক্ষিণে প্রাচীন ও নবীন পলিদ্বারা গঠিত অঞ্চল **ভাঙ্গার ও খাদর** নামে পরিচিত। এই ধরনের সমভূমি মধ্যগতিতে নদীর ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজের ফলে বালুচড়, মিয়েন্ডার, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, বিনুনীরূপী জলনির্গমন প্রণালী প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ গঠন করে। নদীবাহিত দ্বীপ ও বালুচড়ের জন্য ব্রহ্মপুত্র সমভূমি বিশেষভাবে পরিচিত। এই সকল অঞ্চলে সাময়িক বন্যার ফলে নদীর গতিপথে স্থানান্তর এবং বিনুনীরূপী প্রবাহ দ্বারা বৈশিষ্টপূর্ণ।

এই নদীগুলোর মোহনায় পৃথিবীর বড়ো বড়ো ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সুন্দরবন ব-দ্বীপ। অন্যদিকে সমুদ্রতল থেকে 50-150 মিটার উচ্চতায় বৈশিষ্টহীন সমভূমিও সৃষ্টি হয়। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর জলধারা বিভক্ত হয়ে হরিয়ানা ও দিল্লি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসতি অঞ্চল গঠিত হয়েছে। অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তর - পূর্ব থেকে দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে ধুবরির কাছে প্রায় 90° কোণে দক্ষিণমুখী হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীগঠিত সমভূমি খুবই উর্বর হওয়ায় বিভিন্ন শস্য যেমন, ধান, গম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এজন্য এখানে ঘনবসতি দেখা যায়।

3) উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল
(The Peninsular Plateau)

সমুদ্রতল থেকে 150 মিটারের অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট উত্থিত নদী গঠিত সমভূমি যার উচ্চতার ব্যবধান 600-900 মিটার উচ্চ হয়, এমন ত্রিভুজাকৃতি প্রাচীনতম ভূখণ্ডটি **উপদ্বীপীয় মালভূমি** নামে পরিচিত। এই মালভূমি উত্তর-পশ্চিমে দিল্লি (আরাবল্লি) পূর্বে রাজমহল পাহাড়, পশ্চিমদিকে গির অরণ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে কার্ডামম পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। এই মালভূমি উত্তরপূর্বে প্রসারিত হয়ে শিলং ও কার্বি-য়্যাং-লঙ্ মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। উপদ্বীপীয়

চিত্র: 2.11 উপদ্বীপীয় মালভূমির অংশ বিশেষ

ভারত **পাটল্যান্ড** মালভূমির শ্রেণি দ্বারা গঠিত। যেমন হাজারিবাগ মালভূমি, পালামৌ মালভূমি, রাঁচি মালভূমি, মালব মালভূমি, কোয়েম্বাটুর মালভূমি, কর্ণাটক মালভূমি প্রভৃতি। গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের অন্তর্গত এই অংশ ভারতের প্রাচীনতম ও সুস্থিত ভূমিরূপ। সমগ্র উপদ্বীপীয় মালভূমির ঢাল ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্বে নদীর প্রবাহপথ দ্বারা তা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। তবে নর্মদা ও তাপ্তী নদীর ঢাল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উপদ্বীপীয় মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে যেসকল নদী বঙ্গোপসাগরে এবং আরব সাগরে মিশেছে তাদের নাম লেখো পূর্ববাহিনী নদীর গতিপথে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠিত হলেও পশ্চিমবাহিনী নদীর গতিপথে এরূপ ভূমিরেখা দেখা যায় না কেন উল্লেখ করো। এই অঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হল **প্রস্তরময় গিরিচূড়া** (Tors), চ্যুতির ফলে সৃষ্ট **স্তুপ পর্বত** (Block Mountains), **ফাটল, গ্রস্ত উপত্যকা, অভিক্ষিপ্তাংশ** (Spurs) **পাথুরে ভূগঠন, ছোটো ছোটো পাহাড়শ্রেণি** (Series of Hummocky), প্রাচীরের মতো **কোয়ার্জাইট শিলাগঠন,** প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এই মালভূমির পশ্চিম ও উত্তর - পশ্চিম অংশ ব্যাসল্ট শিলাগঠিত কৃষ্ণমৃত্তিকা বা কালো মাটি দ্বারা গঠিত।

চ্যুতি ও ফাটলের ফলে উপদ্বীপীয় মালভূমি কোথাও নীচু হয়ে গেছে; আবার কোথাও উচ্চভূমি সৃষ্টি করেছে (ক্রমাগত ভূ-আলোড়নের ফলে ভীমাচ্যুতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য)। ফলে উপদ্বীপীয় মালভূমির ভূ - প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। মালভূমির উত্তর -পশ্চিমাংশে বিভিন্ন র‍্যাভাইন ও গিরিখাত দেখা যায়। চম্বল, হিন্দ, মোরেনা প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গিরিখাতের উদাহরণ।

ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপদ্বীপীয় মালভূমিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

i) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
ii) মধ্যভাগের উচ্চভূমি
iii) উত্তর-পূর্বের মালভূমি

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
(The Decan Plateau)

এই মালভূমি পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত, পূর্বে পূর্বঘাট পর্বত এবং উত্তরে সাতপুরা, মহাকাল ও মহাদেব পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমঘাট পর্বত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মহারাষ্ট্র সহ্যাদ্রি, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে নীলগিরি, কেরালায় আনাইমালাই ও কার্ডামম প্রভৃতি। পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চতা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে

বিরাজমান। এখানকার গড় উচ্চতা প্রায় 1500 মিটার, উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ বেড়েছে। উপদ্বীপীয় মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল আনাইমালাই পর্বতের আনাইমুদি (2695 মি.), দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ হল নীলগিরি পর্বতের দোদাবেত্তা (2637 মি) উপদ্বীপীয় অংশের অধিকাংশ নদী পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অপর দিকে পূর্বঘাট পর্বত মালার উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম এবং অনিয়মিত ও অসংযুক্ত। কারন এটি মহানদী,গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, প্রভৃতি নদী দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় হল,জাভাদি পাহাড়,পালকোণ্ডা পাহাড়,নাল্লামালা পাহাড়, মহেন্দ্রগিরি পাহাড় প্রভৃতি। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নীলগিরি পাহাড়ে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়।

মধ্যভাগের উচ্চভূমি
(The Central Heghlads)

মধ্যভাগের উচ্চভূমিটি পশ্চিমে আরাবল্লি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত ক্রমান্বয়ে খাড়া ঢালযুক্ত মালভূমি দ্বারা গঠিত, সাধারণত এর উচ্চতাগত ব্যবধান 600-900 মিটার (গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উর্দ্ধে)। এটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সর্ব উত্তরের সীমান্ত গঠন করে। এটি ক্ষয়জাত পর্বতের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যা অধিক নগ্নীভূত হয় এবং ব্যবচ্ছিন্ন শৈলশিরা গঠন করে। উপদ্বীপীয় মালভূমির এই অংশ পশ্চিমে জয়শলমীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই অঞ্চলে অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি, অর্ধচন্দ্রাকার বার্খান প্রভৃতি ভূমিরূপ দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস অনুসারে, রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা এই উচ্চভূমির সৃষ্টি হয়েছে। মার্বেল, শ্লেট, নিস্ প্রভৃতি রূপান্তরিত শিলার উপস্থিতিই এই ধারণাকে সুনিশ্চিত করেছে।

মধ্যভাগের উচ্চভূমিটির গড় উচ্চতার ব্যবধান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 700-1000 মিটার এবং উত্তর থেকে উত্তর - পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। যমুনা নদীর অধিকাংশ উপনদী বিন্ধ্যপর্বত ও কাইমুর পর্বতশ্রেণি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পশ্চিমে অরাবল্লি পর্বতমালা থেকে চম্বলের একমাত্র উপনদী বানস উৎপন্ন হয়েছে। মধ্যভাগের উচ্চভূমি প্রসারিত হয়ে রাজমহল পাহাড় গঠন করেছে। দক্ষিণে রয়েছে ভারতের বিশাল খনিজ ভাণ্ডার **ছোটোনাগপুর মালভূমি**।

উত্তর-পূর্বের মালভূমি
(North Eastern Plateau)

উপদ্বীপীয় মালভূমির প্রসারিত অংশ হল উত্তর-পূর্বের মালভূমি। ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় পাতের উত্তর-পূর্বমুখী সঞ্চরণের ফলে যখন হিমালয়ের উৎপত্তি হয় তখনই এই মালভূমির উৎপত্তি হয়েছে। এর ফলে রাজমহল পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমির মধ্যভাগে অসংখ্য চ্যুতির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে নদীর সঞ্চয় কাজের ফলে নিম্নভূমি ভরাট হয় বর্তমানে মেঘালয় এবং কার্বি-য়্যাং-লং মালভূমি উপদ্বীপীয় মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।

মেঘালয় মালভূমি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত । যথা—

i) গারো পাহাড়
ii) খাসি পাহাড়
iii) জয়ন্তিয়া পহাড়

ওই সকল অঞ্চলের বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীর নামানুসারে সেই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে। আসামের কার্বি-য়্যাং-লং পর্যন্ত এই মালভূমি প্রসারিত। ছোটোনাগপুর মালভূমির মতো মেঘালয় মালভূমিও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। যেমন, কয়লা, আকরিক লৌহ, সিলিমেনাইট (Sillimanite), চুনাপাথর, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে মেঘালয় মালভূমির উপরিভাগ দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চেরাপুঞ্জির শিলাস্তর উন্মুক্ত পাথুরে ভূমিরূপ হওয়ায় এই অঞ্চল স্থায়ী অরণ্যের উপস্থিতি বর্জিত।

4) ভারতীয় মরু অঞ্চল
(The Indian Desert)

আরাবল্লি পর্বতমালার উত্তর - পশ্চিমে ভারতের বৃহৎ মরু অঞ্চল অবস্থিত। এটি তরঙ্গায়িত ভূমিরূপ এবং অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি ও বার্খান দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 150 মিমি-র

চিত্র 2.12 : ভারতীয় মরু অঞ্চল

এই চিত্রটিতে যে ধরনের বালিয়াড়ি প্রদর্শিত হয়েছে তা তোমরা শনাক্ত করতে পারবে কি?

কম। তাই এখানকার জলবায়ু শুষ্ক এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিমাণও কম । এই বৈচিত্র্যময়তার জন্য একে **'মরুস্থলী'** বলা হয়। অনুমান করা হয় যে, মেসোজোইক যুগে এই অঞ্চল সমুদ্রের তলদেশে ছিল। **আকাল** উদ্যানে প্রাপ্ত জীবাশ্মযুক্ত কাঠ (Wood Fossil Park) এবং জয়শলমীরের নিকটে ব্রহ্মশরের সামুদ্রিক সঞ্চয় এই ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করে (জীবাশ্ম কাঠ প্রায় 180 মিলিয়ন বছর আগের)। যদিও মরু অঞ্চলের নিম্নস্থ শিলাগঠন উপদ্বীপীয় মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত। অতিরিক্ত শুষ্ক জলবায়ুর জন্য এখানে যান্ত্রিক আববাহবিকার এবং বায়ুর কাজ বেশি। মরু অঞ্চলের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিরূপ হল **ছত্রাক শিলা** বা **গৌর** (Mushroom rocks), **সঞ্চরণশীল বালিয়াড়ি, মরুদ্যান** (Oasis) সাধারণত মরুভূমির দক্ষিণাংশে দেখা যায়। মরুভূমির অবস্থান অনুসারে একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i) সিন্দ্ ঢাল বরাবর উত্তরাংশ এবং
ii) কচ্ছের রণ বরাবর দক্ষিণাংশ।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদী ক্ষণজীবী। এই মরুভূমির দক্ষিণে প্রবাহিত লুনী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কম বৃষ্টিপাত ও অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ফলে এখানে জলাভাব দেখা যায়। এরফলে নদীগুলো কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে হ্রদ বা প্লায়াতে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এদের **অন্তর্বাহিনী নদী** বলে। এই হ্রদ বা প্লায়ার জল লবণাক্ত হওয়ায় এগুলো লবণের প্রধান উৎস।

5) উপকূলের সমভূমি
(The Costal plains)

তোমরা ইতোমধ্যে ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখা সম্পর্কে পড়ছ। অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই উপকূলীয় সমভূমিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

i) পশ্চিম উপকূলের সমভূমি।
ii) পূর্ব উপকূলের সমভূমি।

i) পশ্চিম উপকূলের সমভূমি

পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি নিমজ্জিত উপকূলীয় সমভূমির একটি

> **কয়াল কী ?**
> ভূ-আন্দোলনের ফলে মালাবার উপকূল বরাবর উত্থান ও নিমজ্জনের ফলে অসংখ্য জলাভূমি ও ব্যাকওয়াটার সৃষ্টি হয়েছে। এই জলাভূমিকেই স্থানীয় ভাষায় ' কয়াল' বলে।

চিত্র 2.13: উপকূলীয় সমভূমি

উদাহরণ। পশ্চিম উপকূলের নিমজ্জিত শহর দ্বারকা কোনো একসময় ভারতের মূল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়।এই নিমজ্জনের ফলে সংকীর্ণ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে যা স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়ে তোলা ও উন্নতির সহায়ক। পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি স্বাভাবিক বন্দর হল, কান্দালা, মাজাগাঁও, জহরলাল নেহেরু বন্দর বা নভসেবা, মার্মাগাঁও, ম্যাঙ্গালোর, কোচি প্রভৃতি। এই উপকূলীয় সমভূমি উত্তরে গুজরাট উপকূল এবং দক্ষিণে কেরালা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পশ্চিম উপকূলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— গুজরাটের কচ্ছ ও কাথিয়াওয়াড় উপকূল , মহারাষ্ট্র ও গোয়ার কোঙ্কন উপকূল, কর্ণাটক ও কেরালার মালাবার উপকূল। পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির মধ্যভাগ সংকীর্ণ এবং উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমশ প্রশস্ত । এই উপকূলীয় সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী মোহনায় ব-দ্বীপ গঠিত হয়নি। মালাবার উপকূলে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ **'কয়াল'** বা **'ব্যাকওয়াটার'** দেখা যায়। এটি মৎস্যচাষ, অন্তর্দেশীয় নৌ-পরিবহণ ও পর্যটনের বিশেষ আকর্ষণ। প্রতিবছর কেরালার **পুন্নমাদা কয়ালে** (Punnamada Kayal) বহুল প্রচলিত **'নেহেরুট্রফি ভাল্লামকলি'** (নৌকা দৌড়) সংগঠিত হয়।

আবার , অনেক সময় অগভীর সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের ঢেউ বা নদীর বয়ে আনা বালি, নুড়ি, কাঁকড় প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে উপকূলের প্রায় সমান্তরালভাবে লম্বা বাঁধের সৃষ্টি করে। এটিকে **পুরোদেশীয় বাঁধ** বলে। কালক্রমে এই বাঁধের পেছনে বৃষ্টি বা সমুদ্রের জল আবদ্ধ হয়ে মূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে **'কয়াল'** বা ব্যাক ওয়াটার-এর সৃষ্টি হয়।

এর নাম ব্যাকওয়াটার কেন ?

ধারণা করা হয়, ওই হ্রদের জল প্রকৃতপক্ষে নদীর জল, নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসে এবং কৃষিজমিতে ব্যবহৃত হয়ে পুনরায় ফিরে

2004 সালের 26 ডিসেম্বর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীণ হয়। তোমরা কি সেই বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নাম জান ? এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা প্রভাবিত আরও কিছু স্থানের নাম খুঁজে বের করতে পারবে কি? এর পরিণাম কী হয়েছিল?

যায়। এজন্য একে ব্যাকওয়াটার বলা হয়। এর সাথে সমুদ্রেরও যোগাযোগ রয়েছে।

দ্বীপপুঞ্জ। এই দুটি দ্বীপপুঞ্জ 10° চ্যানেল দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। সমুদ্র গর্ভস্থ পর্বতসমূহ উত্থিত হয়ে এই দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশৃঙ্গ হল স্যাডল পিক্ (উত্তর আন্দামান 738 মি), মাউন্ট দিয়াভোলো (মধ্য আন্দামান 515 মি), মাউন্ট কোয়োব (দক্ষিণ আন্দামান 460 মি) এবং মাউন্ট থুইলার (বৃহৎ নিকোবর 642 মি)।

বলে অনুমান করা হয়। এই অঞ্চলের কয়েকটি ছোটো দ্বীপ আগ্নেয়গিরির উৎসস্থল। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত ব্যারণ দ্বীপে ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

ii) পূর্ব উপকূলের সমভূমি

পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির তুলনায় পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি প্রশস্ত এবং উত্থানশীল উপকূলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানকার উন্নত ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে এবং নদীগুলো পূর্ববাহিনী হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীতে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা কম। সমুদ্র থেকে 500 কিমি পর্যন্ত মহাদেশীয় বালুচর প্রসারিত হওয়ায় ফলে উন্নত বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব উপকূলের কয়েকটি বন্দরের নাম লেখো।

6) দ্বীপসমূহ (The Islands)

ভারতে প্রধান দুটো দ্বীপপুঞ্জ গোষ্ঠী রয়েছে। এদের একটি আরব সাগরে এবং অপরটি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জটি প্রায় 572 টি ছোটো বড়ো দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এটি 6°-14° উত্তর অক্ষাংশ এবং 92°-94° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর দুটি মুখ্য দ্বীপগোষ্ঠী হল রিচিং দ্বীপমালা এবং লাব্রানথ্ দ্বীপমালা (Ritchie's Archipelago and the Labrynth Island)। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জকে দুটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—উত্তরে আন্দামান এবং দক্ষিণে নিকোবর উপকূল

চিত্র 2.14: দ্বীপপুঞ্জ

রেখায় কোরাল সঞ্চয়ের ফলে সমুদ্রসৈকত খুব সুন্দর এবং পর্যটককে আকর্ষণ করে। এই দ্বীপপুঞ্জে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় এবং নিরক্ষীয় চিরহরিৎ তৃণভূমি দেখা যায়।

আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জ 8°-12° উত্তর অক্ষাংশ এবং 71°– 74° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। কেরালা উপকূল থেকে স্থানভেদে 280–480 কিমি দূরত্বে এই দ্বীপপুঞ্জটি অবস্থিত। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটি প্রবাল (Coral) সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয়েছে। প্রায় 36 টি দ্বীপ নিয়েএই দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত এবং 11 টি দ্বীপপুঞ্জ বসতিযুক্ত। **মিনিকয়** হল বৃহত্তম দ্বীপ, এর আয়তন 453 বর্গ কিমি। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটি 11 ডিগ্রি চ্যানেল দ্বারা বিভক্ত,যার উত্তরে রয়েছে আমিনি দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণে রয়েছে কানান্নোর দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপমালার দ্বীপপুঞ্জটির সৈকত প্রায়শই সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয় এবং এটি অসংহত নুড়ি, কাঁকড়, বালি, পাথর প্রভৃতি দ্বারা গঠিত ও পূর্বদিকে সমুদ্রতীর দ্বারা বেষ্টিত।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

ক) হিমালয়ের কোন্ অংশে আমরা কারেওয়া গঠন দেখতে পাই?

অ) উত্তর-পূর্ব হিমালয় আ) হিমাচল-উত্তরাঞ্চল হিমালয়

ই) পূর্ব হিমালয় ঈ) কাশ্মীর হিমালয়

খ) লোকতাক হ্রদটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

অ) কেরালা আ) উত্তরাঞ্চল

ই) মণিপুর ঈ) রাজস্থান

গ) কোন্ জলভাগ দ্বারা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিভক্ত?

অ) 11° চ্যানেল আ) মান্নার উপসাগর

ই) 10° চ্যানেল ঈ) আন্দামান সাগর

ঘ) কোন্ পর্বতমালায় 'দোদাবেত্তা' শৃঙ্গটি অবস্থিত?

অ) নীলগিরি পর্বতমালা আ) আনাইমালাই পর্বতমালা

ই) কার্ডামম পর্বতমালা ঈ) নাল্লামালাপর্বতমালা

2. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (30 টি শব্দের মধ্যে)।

ক) কোনো ব্যক্তি যদি লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে যান তবে কোন্ উপকূলীয় সমভূমিকে গুরুত্ব দেবেন এবং কেন?

খ) ভারতের কোথায় শীতল মরুভূমি রয়েছে? ওই অঞ্চলের কয়েকটি পাহাড়শ্রেণির নাম লেখো।

গ) পশ্চিম উপকূলে কোনো ব-দ্বীপ গঠিত হয়নি কেন ?

3. নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও (125 টি শব্দের মধ্যে)।

ক) আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

খ) নদীগঠিত সমভূমির প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ?

গ) গঙ্গা নদীর প্রবাহ অনুসারে তুমি যদি বদ্রীনাথ থেকে সুন্দরবন ব-দ্বীপে যাও, তাহলে কোন্ কোন্ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপ অতিক্রম করবে?

প্রকল্প /কাজ :

1. মানচিত্রের সাহায্যে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো ।

2. তোমার রাজ্যের প্রধান প্রধান ভূমিরূপগুলো চিহ্নিত করো এবং ভূমিরূপের ভিত্তিতে বসবাসকারী মানুষদের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো ।

অধ্যায়

3

জলনিকাশি ব্যবস্থা
Drainage System

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, বর্ষাকালে নদীনালা, খালবিল প্রভৃতির মাধ্যমে অতিরিক্ত জল প্রবাহিত হয়ে যায়। যদি এই নালা বা জলপ্রণালী না থাকত, তাহলে বিশাল বন্যার সৃষ্টি হত। যেখানে জলপ্রণালী বা নালা সংকীর্ণ বা আবদ্ধ সেখানে বন্যা একটি সাধারণ ঘটনা।

স্বাভাবিক প্রবাহযুক্ত জলধারাকে 'জলনির্গমন' বলে। পরস্পরসংযুক্ত এরূপ কয়েকটি প্রবাহজালিকাকে জল নির্গমন প্রণালী বলে। কোনো অঞ্চলের জলনির্গমন প্রণালী সেই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সময়,শিলার গঠন ও প্রকৃতি, ভূ- প্রকৃতি, ভূমির ঢাল, জলপ্রবাহের পরিমাণ এবং পর্যায়ক্রমিক প্রবাহ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

তোমার গ্রাম বা শহরের নিকটে নদী আছে কি ? তুমি কি কখনও সেখানে নৌকা চালিয়েছ বা স্নান করেছ ? এটা কী নিত্যবহ (সারা বছর জল থাকে) বা অনিত্যবহ বা প্রবহমান (শুধুমাত্র বর্ষাকালে জল থাকে এবং অন্য সময় শুষ্ক থাকে) ? নদী একই দিকে প্রবাহিত হয় তা কি তোমরা জান ? অন্য দুটো ভূগোল পাঠ্যবই (NCERT -2006) তে তোমরা ভূমির ঢাল সম্পর্কে জেনেছ। তাহলে তোমরা নদীর দিক পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে পারবে কি ? উত্তর ভারতের

চিত্র: 3.1 পার্বত্য অঞ্চলের একটি নদীপ্রবাহ

গুরুত্বপূর্ণ জলনির্গমন প্রণালী

i) বৃক্ষরূপী জলনির্গমন প্রণালী (Dendritic Drainage Pattern) : বৃক্ষের মতো শাখা প্রশাখাযুক্ত জলনির্গমন প্রণালীকে বৃক্ষরূপী জলনির্গমন প্রণালী বলে। উত্তর ভারতের নদীগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ii) কেন্দ্রবিমুখ জলনির্গমন প্রণালী (Radial Drainage Pattern): যখন জলপ্রবাহসমূহ পর্বতশৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে সকলদিকে প্রবাহিত হয় তখন তাকে কেন্দ্রবিমুখ জলনির্গমন প্রণালী বলে। অমরকন্টক পাহাড়শ্রেণি থেকে উৎপন্ন নদীসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

iii) জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী (Trellis Drainage Pattern): যখন মূল উপনদীগুলো প্রধান নদীর সাথে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয় এবং গৌণ উপনদীগুলো সমকোণে তাদের সাথে মিলিত হয়, তখন তাকে জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী বলে,

iv) কেন্দ্রমুখী জলনির্গমন প্রণালী (Centripetal Drainage Pattern): বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে নদীসমূহ যখন কোনো হ্রদ বা জলাভূমিতে মিলিত হয়, তখন সেই জলনির্গমন প্রণালী কে কেন্দ্রমুখী জলনির্গমন প্রণালী বলে। ভূ-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র দেখে এরূপ কয়েকটি জলনির্গমণ প্রণালী খুঁজে বের করো, যা তোমাদের ব্যবহারিক ভূগোল, ভাগ - 1 (Practical Work in Geography, Part -I)-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চিত্র 3.2 : ভারতের প্রধান নদনদীসমূহ

নদীগুলো হিমালয় থেকে এবং দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে কেন ?

যে নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে নদীর জল সংগৃহীত হয় তাকে **অববাহিকা অঞ্চল (Catchment Area)** বলে।

বিভিন্ন নদী ও তার উপনদীবাহিত অঞ্চলকে নদী অববাহিকা বলে। দুটি নদী অববাহিকা জলবিভাজিকা দ্বারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। বৃহৎ নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে নদী বেসিন (River Basin) বলে এবং ছোটো নদী বা নালার বিভাজনকে জলবিভাজিকা বলে। এজন্য নদী বেসিন এবং জলবিভাজিকার মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। জলবিভাজিকা আয়তনে ছোটো এবং বেসিন বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে থাকে।

জলবিভাজিকা এবং নদী বেসিন (River Basin) অভিন্ন। নদী অববাহিকা ও জলবিভাজিকার কোনো একটি অংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব অপরদিকে কীভাবে পড়ে তা বিস্তৃতরূপে এই এককে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এগুলোর প্রভাব ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ পরিকল্পনা অঞ্চলের ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য।

ভারতের জলনিকাশি ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। জলের নির্গমন (সমুদ্রের দিকে) অনুসারে

i) আরব সাগরীয় নিকাশি ব্যবস্থা এবং

ii) বঙ্গোপসাগরীয় নিকাশি ব্যবস্থা— এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দিল্লি শৈলশিরা, আরাবল্লি ও সহ্যাদ্রি (জল বিভাগ চিত্র:3.1) পর্বত দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী দ্বারা 77 শতাংশ জল পরিবাহিত হয় এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে সিন্ধু , নর্মদা, তাপ্তী, মাহি, পেরিয়ার প্রভৃতি নদী দ্বারা ২৩ শতাংশ জল আরব সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

জল বিভাজিকার আকার অনুসারে ভারতের নদীগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা—

i) প্রধান নদী অববাহিকা 20,000 বর্গ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা, তাপ্তী, নর্মাদা,মাহি, পেন্নার, সবরমতী, বরাক সহ মোট 14 টি নদী বেসিন-এর অন্তর্ভুক্ত (পরিশিষ্ট- III)।

ii) মাঝারি নদী অববাহিকার আয়তন 2000 - 20,000 বর্গ কিমি, কালিন্দি, পেরিয়ার, মেঘনা প্রভৃতি নদীসহ 44 টি নদী বেসিন-এর অন্তর্ভূক্ত।

iii) ক্ষুদ্র নদী অববাহিকা 2000 বর্গ কিমি-র কম। সাধারণত কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই নদীপ্রবাহ দেখা যায়।

তোমরা যদি চিত্র নং 3.1 দেখো, তাহলে দেখবে অধিকাংশ নদী হিমালয়পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে বা আরবসাগরে মিশেছে। উত্তর ভারতের নদী এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন উপদ্বীপীয় মালভূমির নদী, যেগুলো বঙ্গোপসাগরে মিশেছে তাদের চিহ্নিত করো। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো খুঁজে বের করো ।

নর্মদা ও তাপ্তী নদী দুটিই দীর্ঘতম ও ব্যতিক্রমী পশ্চিম বাহিনী নদী। এছাড়া আরও কিছু ছোটো পশ্চিমবাহিনী নদী রয়েছে যেগুলো আরব সাগরে মিশেছে।

পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের কোঙ্কন থেকে মালাবার উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত নদীগুলোর নাম লেখো।

উৎস প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতের নদীপ্রবাহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i) হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী

ii) উপদ্বীপীয় অংশ থেকে উৎপন্ন নদী

চম্বল, বেতয়া , শোণ প্রভৃতি নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী অপেক্ষা প্রাচীন হলেও এই শ্রেণিবিভাগটি বেশি গ্রহণযোগ্য। এই বইতে এটাই অনুসরণ করা হয়েছে।

ভারতের জলনিকাশি ব্যবস্থা (Drainage Systems of India)

ভারতের জলনিকাশি ব্যবস্থা অনেকগুলো ছোটো বড়ো নদীর সমন্বয়ে গঠিত। ভূমি বিবর্তন প্রক্রিয়া, ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এবং বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য— এই তিনটির সম্মিলিত প্রভাবে নদীসমূহ সৃষ্টি হয়েছে।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী (The Himalayan Drainage)

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলোর একটি সুদীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন তিনটি প্রধান নদী হল সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র । এই নদীগুলো বৃষ্টির জল ও বরফ গলা জলে পুষ্ট

চিত্র : 3.3 র‍্যাপিডস

থাকে বলে সারা বছর জল থাকে। এই নদীসমূহ হিমালয়ের উপরিভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমাগত ক্ষয়কাজের মাধ্যমে বৃহৎ গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এছাড়াও পার্বত্য প্রবাহে নদী গভীর গিরিখাত, 'V' আকৃতির উপত্যকা, র‍্যাপিড ও কাসকেড, জলপ্রপাত প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠন করে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে নদী যখন সমভূমিতে প্রবেশ করে তখন নদীর সঞ্চয় কার্য শুরু হয়। এর ফলে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, প্লাবনভূমি, পলল শঙ্কু এবং নদী মোহনায় ব-দ্বীপ প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়। পার্বত্য প্রবাহে নদী দ্রুতগতিসম্পন্ন ও অসংখ্য বাঁকযুক্ত থাকে। কিন্তু সমভূমি প্রবাহে সঞ্চয়কার্যের ফলে বাঁকগুলো সুদৃঢ় হয় এবং নদী তখন ক্রমাগত গতিপথ পরিবর্তন করে। ক্রমাগত গতি পথ পরিবর্তনের জন্য কোশী নদীকে বিহারের দুঃখ বলা হয়। উচ্চগতিতে কোশী নদী প্রচুরপরিমাণে বালি বহন করে আনে এবং সমতল ভূমিতে সঞ্চয় করে। এর ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয় বলে নদী ক্রমাগত তার প্রবাহপথ পরিবর্তন করে। উচ্চাতিতেই কোশী নদী এত পলি বহন করে আনে কেন ? তোমরা কি নদীর জলের এই পরিবহণকে স্বাভাবিক মনে কর? বিশেষত কোশী নদীর ক্ষেত্রেও কী একই ধারণা, না কি এই নদী অশান্ত? বন্যার সুফল ও কুফলগুলো কী কী ?

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীসমূহের বিবর্তন (Evolution of the Himalayan Drainage)

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীসমূহের বিবর্তন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে ভূতাত্ত্বিকদের মতে, শিবালিক বা ইন্দো-ব্রহ্ম নামে একটি শক্তিশালী নদী আসাম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত হিমালয়ের অনুদৈর্ঘ্য প্রস্তচ্ছেদ বরাবর প্রবাহিত হয়ে সিন্দের দিকে যায়। অবশেষে 5-24 মিলিয়ন বছর আগে মাইয়োসিন যুগে নিম্ন পাঞ্জাবের কাছাকাছি সিন্দ উপসাগরে পতিত হয় 'প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব' (Fundamentals of Physical Geography, NCERT-2006) বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভূতাত্ত্বিক সময় কালটি দেখো) শিবালিকের গঠনগত ধারাবাহিকতা, এই অঞ্চলের হ্রদসমূহের উৎস, পলল সঞ্চয়, বালির সঞ্চয়, সিল্ট, কাদা, প্রস্তর এবং কংগ্লোমারেট উপস্থিতি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

অনুমান করা হয় যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইন্দো-ব্রহ্ম নদীটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। যথা— i) পশ্চিম অংশে রয়েছে সিন্ধু ও তার পাঁচটি উপনদী, ii) মধ্যভাগে গঙ্গা ও হিমালয় থেকে উৎপন্ন তার উপনদীসমূহ ; এবং iii) পূর্ব অংশে আসামের ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় থেকে উৎপন্ন তার উপনদীসমূহ। পশ্চিম হিমালয়ের এই বিভাজন সম্ভবত প্লেইস্টোসিন অভ্যুত্থান ও পাটোয়ার মালভূমির উত্থানের (দিল্লি শৈলশিরা) ফলে হয়েছে, যা সিন্ধু ও গঙ্গার জল প্রবাহকে পৃথক করেছে। অনুরূপভাবে মধ্য প্লেইস্টোসিন যুগে রাজমহল পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমির মধ্যভাগে মালদা গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

পার্বত্য হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী প্রবাহসমূহ (The River Systems of the Himalayan Drainage)

হিমালয় পর্বতমালা থেকে অসংখ্য নদী উৎপন্ন হলেও প্রধান প্রধান নদীগুলো নিম্নরূপ—

সিন্ধুপ্রবাহ (The Indus System)

সিন্ধু নদ বিশ্বের একটি বৃহত্তম নদ। এই অববাহিকার আয়তন 11,65,000 বর্গ কিমি (ভারতে 321,289 বর্গ কিমি) এবং মোট দৈর্ঘ্য 2880 কিমি (ভারতে 1114 কিমি) । এই নদ হিমালয়ের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে উৎপন্ন হয়ে সিন্ধু নামে ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদ তিব্বতের বোকার চো (31°15´ উত্তর অক্ষংশ এবং 81°40´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)-র কাছে 4164 মি. উচ্চতায় কৈলাস পর্বতের মানসরোবরের অন্তর্গত সেংগি জাংবো (Sengge Zangbo) হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিব্বতে এই নদী 'সিংহি খামবান' বা 'সিংহের মুখ (Lion's Mouth) নামে পরিচিত। লাডাক এবং জাস্কর পর্বতশ্রেণির মধ্য দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে লাডাক ও বালুচিস্তানকে অতিক্রম করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের গিলগিটের কাছে লাডাক পর্বতশ্রেণিকে পৃথক করে আকর্ষণীয় গিরিখাত গঠন করেছে। এই নদ দারিস্থান অঞ্চলের চিলাসের পাশ দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। দারিস্তান নামে পরিচিত অঞ্চলটি চিহ্নিত করো।

সিন্ধু নদের সাথে হিমালয় থেকে উৎপন্ন অসংখ্য উপনদী যেমন সায়ক, গিলগিট, জাস্কর, হুনজা, নুব্রা, শিগর, দ্রাস প্রভৃতি মিলিত হয়েছে। অবশেষে অট্টোকের নিকটে পর্বত থেকে নির্গত হয়ে কাবুল নদী সিন্ধু নদের ডান তীরে মিশেছে। সিন্ধুর ডান তীরের অন্যান্য উপনদীগুলো হল খুরাম, টোচি, গোমাল, ভিবোয়া, সঙ্গার প্রভৃতি। এই উপনদীগুলো সুলেইমান পর্বতশ্রেণি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীগুলো দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ' মিথানকোট' (Mithankot) -এর খানিকটা ঊর্দ্ধে পঞ্চনদের সাথে মিলিত হয়েছে। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর মিলিত প্রবাহকে 'পঞ্চনদ' বলে। এই পাঁচটি নদী হল শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা অতঃপর নদীগুলো করাচির পূর্বদিক দিয়ে আরবসাগরে পতিত হয়েছে। ভারতের

শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের ওপর দিয়েই সিন্ধু নদ প্রবাহিত হয়েছে।

সিন্ধুর প্রধান উপনদী বিপাশা (Jhelum) কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে পিরপঞ্জালের পাদদেশে ভেরিনাগ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই নদী শ্রীনগর ও উলার হ্রদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশের পূর্বে সংকীর্ণ গভীর গিরিপথের সৃষ্টি করেছে।

সিন্ধুর দীর্ঘতম উপনদী হল চন্দ্রভাগা (Chanab)। চন্দ্র এবং ভাগা — এই দুটি নদীর মিলিত প্রবাহ হল চন্দ্রভাগা। হিমাচল প্রদেশের কিলং -এর কাছে তান্ডিতে এই দুটি জলধারা মিলিত হয়েছে। এজন্য এই দুটি নদীকে একত্রে চন্দ্রভাগা বলা হয়। পাকিস্তানে প্রবেশের পূর্বে ভারতে এই নদীর দৈর্ঘ্য 1180 কিমি।

সিন্ধুর অপর গুরুত্বপূর্ণ উপনদী হল ইরাবতী(Ravi)। হিমাচল প্রদেশের কুলু পাহাড়ের রোহটাং গিরিপথের পশ্চিম দিকে থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং চম্বল উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদী পাকিস্তানে প্রবেশের পূর্বে সারাই সিন্ধুর কাছে চন্দ্রভাগা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। পিরপঞ্জালের দক্ষিণ-পূর্বঅংশ এবং ধওলাধর পর্বত শ্রেণির মধ্যভাগ দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে।

সিন্ধুর অপর গুরুত্বপূর্ণ উপনদী বিতস্তা (Beas) সমুদ্রতল থেকে 4000 মিটার উচ্চতায় রোহটাং গিরিপথের (Rohtang Pass) কাছে বিতস্তা কুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কুলু উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাটি ও ধওলাধর পর্বতে লারগি গিরিখাত গঠন করেছে। হরকির পাশে শতদ্রু যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে এই নদী পাঞ্জাব সমভূমিতে প্রবেশ করেছে।

তিব্বতের মানস সরোবরের নিকটে 4555 মিটার উচ্চতায় রাকাস হ্রদ থেকে শতদ্রু নদী উৎপন্ন হয়েছে। তিব্বতে এটি **লাঙচেন খামবার** নামে পরিচিত। ভারতে প্রবেশের পূর্বে প্রায় 400 কিমি পর্যন্ত সিন্ধুর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে এবং এটা রূপারে গিরিখাত গঠন করেছে। এই নদী হিমালয় পর্বতমালার সিপকি- লা গিরিপথের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাঞ্জাব সমভূমিতে প্রবেশ করেছে। ভাকরা-নাঙ্গাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি এই শতদ্রু নদীর উপর নির্মিত হয়েছে।

গঙ্গা প্রবাহ (The Ganga Syntem)

অববাহিকা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য উভয় দিক থেকেই গঙ্গা ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। উত্তরাঞ্চলের উত্তরকাশী জেলায় গোমুখ(3900 মি.) এর কাছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। এখানে গঙ্গা ভাগীরথী নামে পরিচিত। সংকীর্ণ গিরিখাতের মাধ্যমে এটা মধ্য ও শিবালিক হিমালয়কে পৃথক করেছে।দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী অলকানন্দার সাথে মিলিত হয়েছে। এরপর দুটো নদীর মিলিত প্রবাহ গঙ্গা নামে পরিচিত। বদ্রীনাথের উপরিভাগের সাতোপন্থ হিমবাহ থেকে অলকানন্দার উৎপত্তি। যোশীমঠ বা বিষ্ণুপ্রয়াগের কাছে অলকানন্দা ধৌলি এবং বিষ্ণুগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। অলকানন্দার অপর উপনদী পিন্দর কর্ণপ্রয়াগে এবং মন্দাকিনী বা কালীগঙ্গা রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সাথে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গা সমভূমিতে প্রবেশ করেছে।এখান থেকে গঙ্গা প্রথমে দক্ষিণ, তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব দিকে প্রবাহের পূর্বে ভাগীরথী ও হুগলি নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ভারতে গঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য 2525 কিমি। উত্তরাঞ্চল (110 কিমি), উত্তরপ্রদেশ (1450 কিমি), বিহার (445 কিমি), এবং পশ্চিমবঙ্গের (520 কিমি) ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। শুধুমাত্র ভারতে গঙ্গা অববাহিকার আয়তন প্রায় 8.6 লক্ষ বর্গ কিমি। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে উপদ্বীপীয় অংশে উৎপন্ন অসংখ্য নিত্যবহ ও অনিত্যবহ নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম নদী।

উপনদীসমূহ : যমুনা ও শোণ নদী হল গঙ্গার ডান তীরের প্রধান উপনদী। অপরদিকে বামতীরের প্রধান উপনদীগুলো হল রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা প্রভৃতি। অবশেষে সাগরদ্বীপের কাছে এই নদী বঙ্গোপসাগরের সাথে মিশেছে।

যমুনা নদী : গঙ্গার পশ্চিম প্রান্তের দীর্ঘতম উপনদী হল যমুনা। বান্দেরপাঞ্চ পর্বতশ্রেণি (6316 কিমি)-র পশ্চিম ঢালের যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে যমুনা নদী উৎপন্ন হয়েছে। এলাহাবাদের প্রয়াগে যমুনা নদী গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। চম্বল, বেতোয়া, সিন্দ, কেন্ প্রভৃতি যমুনার ডান তীরের উপনদী। এগুলো উপদ্বীপীয় মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অপরদিকে হিন্দান, রিন্দ্, সেঙ্গার, বরুণা প্রভৃতি হল বামতীরের উপনদী। এই নদীগুলোর অধিকাংশই পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে যমুনা নদীর প্রবাহকে সচল রেখেছে। আগ্রা সেচখালের জলও এখান থেকে সরবরাহ করা হয়।

চম্বল নদী: মধ্যপ্রদেশের মৌ (Mhow)এর নিকট মালব মালভূমি থেকে চম্বল নদী উৎপন্ন হয়ে সংকীর্ণ গিরিখাতের মাধ্যমে রাজস্থানের কোটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, যেখানে গান্ধি সাগর বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এটি কোটা থেকে বুন্দি, সাওয়াই মাধোপুর, ঢোলপুর হয়ে অবশেষে যমুনা নদীর সাথে মিশেছে। বন্ধুর ও অনুর্বর ভূমিরূপের

যমুনা নদী যে রাজ্যগুলোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাদের নাম লেখো।

জন্য চম্বল অববাহিকা বিখ্যাত এবং একে চম্বল খাদ বা গিরিখাতও (Chambal Ravines.) বলা হয়।

গণ্ডক নদী : কালীগণ্ডক ও ত্রিশূল গঙ্গার মিলিত প্রবাহ গণ্ডক নামে পরিচিত। নেপালের অন্তর্গত ধবলগিরি ও মাউন্ট এভারেস্টের মধ্যভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে নেপালের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিহারের চম্পারণ জেলা দিয়ে এই নদী গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবেশ করেছে এবং পাটনার নিকটে শোণপুরে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

ঘর্ঘরা নদী : মাপচাচুঙ্গো হিমবাহ থেকে ঘর্ঘরা নদীর উৎপত্তি। তিলা, সোত, বেরি প্রভৃতি উপনদীর জলে পুষ্ট হয়ে ঘর্ঘরা নদী শিশাপানিতে গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে পর্বত থেকে বেরিয়ে আসে। সমভূমিতে এসে সারদা (কালী বা কালীগঙ্গা) নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং শেষে ছাপরায় গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

কোশী নদী : কোশী একটি প্রাচীন নদী। তিব্বতে মাউন্ট এভারেস্টের উত্তরে এই নদীর উৎপত্তি 'অরুণ' হল এর মূল প্রবাহ। নেপালে এই নদী মধ্য হিমালয় অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে শোণ কোশীর সাথে এবং পূর্ব দিকে তামুর কোশীর সাথে মিলিত হয়েছে। অরুণ নদীর সাথে মিলিত হয়ে এটি সপ্তকোশী নামে প্রবাহিত হয়েছে।

রামগঙ্গা নদী : রামগঙ্গা তুলনামূলকভাবে ছোটো নদী। এটি গাইরসানের (Gairsain) নিকটে গাড়োয়াল পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শিবালিক অতিক্রম করে, এই নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গতিপথ পরিবর্তন করে এবং নাজিবাবাদের নিকটে উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেছে। অবশেষে কনৌজে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

দামোদর নদ : ছোটোনাগপুর মালভূমির একেবারে পূর্বপ্রান্তে গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। বরাকর এর প্রধান উপনদী। প্রতিবছর বন্যায় প্লাবিত হত বলে কোনো এক সময় এই নদীকে 'বাংলার দুঃখের নদ' বলা হত। এরপর দামোদর নদের উপর 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' নামে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গৃহীত হলে বন্যার হাত থেকে মানুষ রক্ষা পায়।

সারদা বা সরযূ নদী : নেপাল হিমালয়ের মিলাম হিমবাহ থেকে সরযূ নদীর উৎপত্তি, উৎসস্থলে ইহা **গোরীগঙ্গা** নামে পরিচিত। ভারত-নেপাল সীমান্তে এই নদী কালী বা চৌক নামে প্রবাহিত হয়ে ঘর্ঘরা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

মহানন্দা নদী : গঙ্গার এই গুরুত্বপূর্ণ উপনদীটি দার্জিলিং পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গঙ্গার বামতীরের সর্বশেষ উপনদীরূপে পশ্চিমবঙ্গে এই নদী গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

শোণ্ নদী : অমরকণ্টক পাহাড় থেকে শোণ্ নদী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদী গঙ্গার ডান তীরের বৃহত্তম উপনদী। পর্বতপ্রান্তে অসংখ্য জলপ্রপাত সৃষ্টি করে এই নদী পাটনার পশ্চিমে আরাহ(Arrah)-তে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ (The Brahmaputra System)

পৃথিবীর একটি বৃহত্তম নদ হল ব্রহ্মপুত্র নদ। কৈলাস পর্বতের নিকটে মানস সরোবরের চেমাংদুয়াং হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। উৎসস্থল থেকে প্রায় 1200 কিমির মতো শুষ্ক অঞ্চলের উপর দিয়ে এই নদ উলম্বভাবে প্রবাহিত হয়েছে। তিব্বতের দক্ষিণে এই নদ 'সাংপো' নামে প্রবাহিত। 'সাংপো' শব্দের অর্থ সংশোধক(Purier)। তিব্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত এই নদের ডান তীরের প্রধান উপনদী রাঙ্গো সাংপো। উত্থানের পর নামচা বারওয়া (7755মি.) নিকটে মধ্য হিমালয় বা অবহিমালয়ে অদমনীয় ও গতিশীলতার জন্য গভীর গিরিখাত গঠন করে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদ পর্বতের পাদদেশে সিয়াং বা দিহাং নামে প্রবাহিত হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের সাদিয়া শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে এই নদ ভারতে প্রবেশ করে দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর বাম তীরের উপনদী যেমন - ডিবং বা শিকাং, লোহিত প্রভৃতি নদীর মিলিত প্রবাহ **ব্রহ্মপুত্র** নামে পরিচিত।

ব্রহ্মপুত্র নদ আসাম উপত্যকার উপর দিয়ে 750 কিমি প্রবাহপথে অসংখ্য উপনদী রয়েছে। এর বাম তীরের প্রধান উপনদী হল বুড়ি, ডিহিং, ধারসিড়ি (দক্ষিণ) এবং ডানতীরের প্রধান উপনদীগুলো হল সুবর্ণসিড়ি, কামেং, মানস এবং সংকোশ। সুবর্ণসিড়ি নদী তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ববাহিনী নদীরূপে আসামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ধুবুরির নিকটে ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশের পর দক্ষিণবাহিনী নদীরূপে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরে মিলিত হয়ে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বন্যা, গতিপথ পরিবর্তন, পার্শ্বক্ষয় প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ বিখ্যাত। দীর্ঘ উপনদী, অতিরিক্ত পলি পরিবহণ ও অববাহিকা অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

উপদ্বীপীয় অংশের জলপ্রবাহ (The peninsular Drainage system)

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলোর চেয়ে উপদ্বীপীয় অংশের নদীগুলো প্রাচীন। নদীগুলো মূলত প্রশস্ত ও পর্যায়িত অগভীর উপত্যকা এবং নদীসমূহের পরিণত অবস্থাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পশ্চিম উপকূলের সন্নিহিত পশ্চিমঘাট পর্বত উপদ্বীপীয় অংশের নদীগুলোর প্রধান জলবিভাজিকা। এর মধ্যে দীর্ঘ নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে এবং ক্ষুদ্র নদীগুলো আরবসাগরে মিশেছে।

উপদ্বীপীয় অংশের প্রধান পশ্চিমবাহিনী নদী হলো নর্মদা ও তাপ্তী। চম্বল,সিন্দ, বেতোয়া, কেন্, শোণ্ প্রভৃতি নদী উপদ্বীপের উত্তরাংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। উপদ্বীপীয় অংশের অন্যান্য নদীগুলো হল মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদী। নির্দিষ্ট গতিপথ, বাঁকের অনুপস্থিতি এবং সারাবছর জলপ্রবাহ না থাকা প্রভৃতি উপদ্বীপীয় অংশের নদীসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নর্মাদা ও তাপ্তী হল একমাত্র উপদ্বীপীয় নদী যেগুলো গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

উপদ্বীপীয় জলপ্রবাহের ক্রমবিবর্তন
(The Evolution of Drainage System)

ভূতাত্ত্বিক সময়সূচির তিনটি প্রধান ভূতাত্ত্বিক গঠনের প্রভাবে উপদ্বীপীয় ভারতের বর্তমান জলনির্গমণ প্রনালীসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। যথা-

i) প্রাক্ টার্সিয়ারি যুগে, উপদ্বীপেরপশ্চিমাংশ অবনমনের ফলে সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত হয়েছে। এর ফলে প্রতিসম ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে এবং নদীর উভয় দিকের মূল বিভাজিকাকে ব্যাহত করেছে।

ii) হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে উত্থিত হয়ে উপদ্বীপীয় অংশে অবনমনের ফলে ক্রমান্বয়ে চ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে। চ্যুতি ও ফাটলের মধ্য দিয়ে নর্মদা ও তাপ্তী প্রবাহিত হয়েছে এবং নদীবাহিত পদার্থ দ্বারা মূল ফাটলগুলো ভরাট হয়ে যায়। এজন্য এই সকল নদীতে পলির পরিমাণ কম থাকে এবং ব-দ্বীপ বিশেষ দেখা যায় না।

iii) উপদ্বীপীয় অংশে ভূমিরূপ উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু হওয়ার ফলে এখানকার নদীগুলো সেই সময় থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

উপদ্বীপীয় অংশ বা দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ
(River system of the Peninsular Drainage)

উপদ্বীপীয় অংশে অসংখ্য নদী রয়েছে। উপদ্বীপীয় অংশের প্রধান প্রধান নদীগুলো নিম্নরূপ—

মহানদী নদী : ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার শিহাওয়ারের নিকট মহানদী নদীর উৎপত্তি এবং ওড়িশার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এই নদী 851 কিমি দৈর্ঘ্য এবং অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন 1.42 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এই নদীর নিম্নগতিতে কিছু নৌ-পরিবহণও রয়েছে। এই নদী প্রবাহপথের 53 শতাংশ রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে এবং অবশিষ্ট 47 শতাংশ রয়েছে ওড়িশাতে।

গোদাবরী নদী : উপদ্বীপীয় অংশের তথা দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী হল গোদাবরী। এই নদীকে 'দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা' - ও বলা হয়। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্রিম্বক শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এর উপনদীগুলো মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ,ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য 1465 কিমি এবং অববহিকার আয়তন 3.13 লক্ষ বর্গ কিমি, এর 49 শতাংশ মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত, 20 শতাংশ মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের অন্তর্ভুক্ত। পেনগঙ্গা, ইন্দ্রাবতী, প্রাণহিতা, মঞ্জিরা প্রভৃতি গোদাবরীর প্রধান উপনদী। গোদাবরীর নিম্নগতিতে পোলাভরমের দক্ষিণে যেখানে চিত্রানুগ গিরিখাত সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে খুব বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। শুধুমাত্র ব-দ্বীপ অঞ্চলেই নৌ-পরিবহণের সুবিধা রয়েছে। গোদাবরী নদী রাজামুণ্ড্রীর পর বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে বৃহদাকার ব-দ্বীপ গঠন করেছে।

কৃষ্ণা নদী : উপদ্বীপীয় অংশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী কৃষ্ণা মহাবালেশ্বরের নিকট সহ্যাদ্রি পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রধান উপনদীগুলো হল কয়না, তুঙ্গভদ্রা এবং ভীমা। এই অববাহিকার মোট আয়তনের 27 শতাংশ মহারাষ্ট্র, 44 শতাংশ কর্ণাটক এবং 29 শতাংশ অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার অন্তর্ভূক্ত। বিজয়ওয়াডার নিকট কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ব-দ্বীপ গঠন করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

কাবেরী নদী : কর্ণাটকের কুর্গ জেলায় পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি পাহাড় (1341 মি উচ্চতা) থেকে কাবেরী নদীর উৎপত্তি। এই নদী 800 কিমি দীর্ঘ এবং অববাহিকায় আয়তন 81,155 বর্গ কিমি। উত্তর অববাহিকার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ফলে গ্রীষ্মকালে এবং নিম্ন (দক্ষিণ) অববাহিকায় উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। উপদ্বীপীয় অংশের অন্যান্য নদী থেকে কাবেরী নদীর জলতলের ওঠানামা তুলনামূলকভাবে কম এবং এই নদীতে সারাবছর জল থাকে। কেরালায় 3 শতাংশ, কর্ণাটকে 41 শতাংশ, তামিলনাড়ুতে 56 শতাংশ কাবেরী নদী অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত। কাবেরী নদীর প্রধান উপনদী হল কবিনি, ভবানী, অমরাবতী প্রভৃতি।

নর্মদা নদী : মধ্যপ্রদেশের মহাকাল পর্বতের অমরকন্টক (1,057 মিটার উঁচু) শৃঙ্গের পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা নদী উৎপন্ন হয়েছে। দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত এবং উত্তরে বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী গ্রস্থ উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মার্বেল পাথরে চিত্তাকর্ষক গিরিখাত গঠন করেছে এবং জব্বলপুরের নিকটে নয়নাভিরাম 'ধুঁয়াধর জলপ্রপাত' সৃষ্টি করেছে। এই নদী প্রায় 1312 কিমি পথ অতিক্রম করে দক্ষিণে ভারতে 27 কিমি দীর্ঘ মোহনা গঠন করে আরবসাগরে মিশেছে। এই নদী অববাহিকার আয়তন প্রায় 98,796 বর্গ কিমি এই নদীতে সর্দার সরোবর প্রকল্প নির্মিত হয়েছে।

তাপ্তী নদী : পশ্চিমবাহিনী অপর গুরুত্বপূর্ণ নদী হল তাপ্তি। মধ্য প্রদেশের বেতুল জেলায় মহাদেব পর্বতের মূলতাই উচ্চভূমি থেকে এই নদী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদী 724 কিমি দীর্ঘ এবং অববাহিকার আয়তন 65,145 বর্গ কিমি। এর প্রায় 79 শতাংশ মহারাষ্ট্র, 15 শতাংশ মধ্যপ্রদেশ এবং অবশিষ্ট 6 শতাংশ অঞ্চল গুজরাটে রয়েছে।

লুনি নদী : আরাবল্লির পশ্চিমে অবস্থিত রাজস্থানের দীর্ঘতম নদী হল লুনি নদী। উৎসস্থল থেকে পুষ্করের নিকটে সরস্বতী ও সবরমতী নামে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং গোবিন্দগড়ের কাছে পুনরায় মিলিত হয়েছে। আরাবল্লির উত্তরাংশে আনাসাগর হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে লুনি নামে প্রবাহিত হয়েছে। তেলওয়ারা (Telwara) পর্যন্ত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে কচ্ছের রণে মিশেছে। ত্রটি ভারতের একটি অন্তর্বাহিনী নদী।

পশ্চিমবাহিনীর অন্যান্য ক্ষুদ্র নদীসমূহ
(Smaller Rivers flowing towards the west)

আরবসাগরের দিকে প্রবাহিত অন্যান্য পশ্চিমবাহিনী নদীগুলোর প্রবাহপথ কম। এই নদীগুলোর প্রবাহপথ কম কেন? গুজরাটের ছোটো নদীগুলোর নাম খুঁজে বের করো। সেত্রুনিজি (Shetruniji) হল এমন একটি নদী যা আমরেলি জেলার ডালকাওয়ার (Dalkahwa) নিকটে উৎপন্ন হয়েছে। ভদ্রা নদী রাজকোট জেলার অনিয়ালির নিকটে উৎপন্ন হয়েছে। পাঁচমহল জেলায় ঘণ্টুরের নিকট ধাধর নদী উৎপন্ন হয়েছে।

নাসিক জেলায় 670 মি উচ্চতায় ত্রিম্বক শৃঙ্গ থেকে বৈতণ নদী উৎপন্ন হয়েছে। বেলগাও জেলা থেকে **কালিন্দী নদী** উৎপন্ন হয়েছে এবং কারওয়ার উপসাগরে পড়েছে। হুবলি ধারওয়ার থেকে **বেদবতী নদী** উৎপন্ন হয়ে 161 কিমি পথ অতিক্রম করে আরবসাগরে

> এই নদীগুলোর সঙ্গমস্থল খুঁজে বের করো। মহারাষ্ট্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত পশ্চিমবাহিনী নদীগুলো শনাক্ত করো।

মিশছে। অপর গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবাহিনী নদী **সরাবতী নদী** কর্ণাটকের ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়েছে। কর্ণাটকের সিমোগা জেলা থেকে সরাবতী নদী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদী অববাহিকার আয়তন 2,209 বর্গকিমি।

> **কোন্ নদীতে গেরসোপ্পা (যোগ) জলপ্রপাতটি রয়েছে?**

গোয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত দুটো গুরুত্বর্পূণ পশ্চিমবাহিনী নদী হল **মাণ্ডবী** এবং **জুয়ারি**। মানচিত্রে এদের চিহ্নিত করো।

কেরালার উপকূলরেখা সংকীর্ণ। আন্নামালাই পাহাড় থেকে **কেরালার দীর্ঘতম নদী ভরতপুঝা** (Bharathapuzha) উৎপন্ন হয়েছে। এই নদী 'পোন্নানি' নামেও পরিচিত এই নদী অববাহিকার আয়তন 5,397 বর্গকিমি কর্ণাটকের সবরমতী নদী অববাহিকার সাথে এই নদী অববাহিকার তুলনামূলক আলোচনা করো।

কেরালার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী হল **পেরিয়ার**। এই নদী অববাহিকার আয়তন 5243 বর্গকিমি। ভরতপুঝা ও পেরিয়ার নদী অববাহিকার মধ্যেকার বিপুল পার্থক্য খুঁজে বের করো।

কেরালার অপর গুরুত্বপূর্ণ নদী হল **পামরা**। এই নদী 177 কিমি পথ অতিক্রম করে ভেম্বানদ হ্রদে মিশেছে।

পশ্চিমবাহিনীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহ ও তাদের অববাহিকা অঞ্চল নিম্নে সারণির মাধ্যমে দেখানো হল -

নদী	অববাহিকা অঞ্চল (বর্গ কিমি)
সবরমতী	21,674
মাহি	34,842
ধাধর	2,770
কালিন্দী	5,179
সরাবতী	2,029
ভরতপুঝা	5,397
পেরিয়ার	5,243

পূর্ববাহিনীর অন্যান্য ক্ষুদ্রতম নদীসমূহ
(Small River flowing towards the East)

অসংখ্য ছোটো বড়ো নদী ও তাদের উপনদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। তোমরা কি এমন কিছু নদীর নাম বলতে পারবে? নদীগুলো দৈর্ঘ্যে ছোটো এবং বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। প্রতিটি নদীই গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। সুবর্ণরেখা, বৈতরনি, ব্রাহ্মণী, ভামসাধারা, পেন্নার, পালার, ভাইগাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদী। মানচিত্র থেকে এই নদীগুলোকে খুঁজে বের করো।

পূর্ববাহিনীর ছোটো নদী ও তাদের অববাহিকা নীচে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো-

নদী	অববাহিকা অঞ্চল (বর্গ কিমি)
সুবর্ণরেখা	19,296
বৈতরণী	12,789
ব্রাহ্মণী	39,033
পেন্নার	55,213
পালার	17,870

সরণি : 3.1 হিমালয় বা উত্তর ভারতের নদী এবং উপদ্বীপীয় অঞ্চল বা দক্ষিনভারতের নদী সমূহের তুলনামূলক আলোচনা :

ক্রমিক নং	পার্থক্যের ভিত্তি	হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী	উপদ্বীপীয় অংশ থেকে উৎপন্ন নদী
1	উৎসস্থল	হিমবাহ দ্বারা আবৃত হিমালয় পার্বত্য উচ্চভূমি।	উপদ্বীপীয় মালভূমি এবং মধ্যভাগের উচ্চভূমি।
2	প্রবাহের প্রকৃতি	নিত্যবহ : হিমবাহ ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলে সারাবছর জল প্রবাহ থাকে।	ঋতুকালীন: শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয় বলে বর্ষাকালে জলপ্রবাহ থাকে।
3	নির্গমনের প্রকার	অবরোহী ও অনুগামী নদী দ্বারা সমতল ভূমিতে বৃক্ষরূপী জলনির্গমন প্রণালীর প্রাধান্য দেখা যায়।	অধ্যারোপিত এবং পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ফলে জাফরিরূপী, কেন্দ্রবিমুখ, আয়তাকার জলনিগর্মন প্রণালী দেখা যায়।
4	নদীর প্রকৃতি	নদীগুলো দীর্ঘ, পার্বত্য প্রবাহে ব্যাপক ক্ষয়কাজ ও বহন কাজের মাধ্যমে সমভূমিতে পৌঁছায়। সেখানে আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত হয়।	নদীগুলো তুলনামূলকভাবে ছোটো ও গতিপথ সুস্থির। গ্রস্থ উপত্যকার মাধ্যমে নদী প্রবাহিত হয়েছে।
5	অববাহিকা অঞ্চল	নদী অববাহিকা খুবই দীর্ঘ।	নদী অববাহিকা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ।
6	নদীর বয়ঃকাল	নদীগুলো বয়সে নবীন, স্বাভাবিক প্রবাহ এবং গভীর উপত্যকা গঠন করে।	নদীগুলো বয়সে প্রাচীন বলে ক্ষয়কার্য কম এবং নদীখাত গভীর হয় না।

নদীপ্রবাহ (River Regimes)

তোমরা কি জান যে, সারা বছর নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ সমান থাকে না? ঋতুভেদে জলপ্রবাহের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। গঙ্গা এবং কাবেরী নদীতে কোন্ ঋতুতে সর্বাধিক জলপ্রবাহ থাকবে বলে তোমরা আশা কর? সারাবছর ধরে নদীতে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাই হল নদীর জলপ্রবাহ (River Regimes)। উত্তর ভারতের নদীগুলো হিমালয়ের বরফ গলা জলে পুষ্ট থাকায় সারাবছর জল থাকে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জলেও পুষ্ট হয়। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়নি বলে নদী প্রবাহে জলের ওঠানামার সাক্ষ্য বহন করে। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে জলপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহের জলপ্রবাহ বৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাই নয়, উপদ্বীপীয় মালভূমিও জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নদীর একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তা বিভিন্ন এককে পরিমাপ করা হয়। নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘনফুট জল প্রবাহিত হয় তাকে বলে **কিউসেক (কিউবিক ফুট/সেকেন্ড)**। অপর দিকে ঘনফুটের পরিবর্তে যখন ঘনমিটারে এই হিসেব করা হয় তখন তাকে কিউমেক **(কিউবিক মিটার / সেকেন্ড)** বলে।

জানুয়ারি থেকে জুন এই ক-মাস গঙ্গানদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ কম থাকে। অপরদিকে সর্বাধিক জলপ্রবাহ দেখা যায় আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে জলপ্রবাহ অকস্মাৎ কমতে থাকে। এজন্য বর্ষাকালে নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণে তারতম্য ঘটে।

গঙ্গা অববাহিকার পূর্ব এবং পশ্চিম পার্শ্বের জলপ্রবাহে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। প্রাক্-গ্রীষ্মে, মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পূর্বেই বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় গঙ্গা নদীর জলপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধিপায়। গঙ্গার গড় সর্বাধিক জলপ্রবাহের পরিমাণ প্রায় 55000 কিউসেক এবং সর্বনিম্ন জলপ্রবাহের পরিমাণ 1300 কিউসেক। এই পরিমাপ গঙ্গার ফরাক্কাতে করা হয়েছে। বিশাল এই পার্থক্যের কারণগুলো কী কী?

হিমালয়ের নদীগুলোর সাথে উপদ্বীপীয় অংশের দুটো নদীর জলপ্রবাহের আকর্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। নর্মদা নদীতে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে জলপ্রবাহের পরিমাণ কম থাকে কিন্তু আগস্ট মাসে হঠাৎ করেই জলপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে যায়। আগস্ট মাসে বেড়ে যাওয়া ও অক্টোবরে কমে যাওয়াটা অন্ত্যন্ত লক্ষণীয়। গুরুদেশ্বরে নর্মদা নদীর জলপ্রবাহ লিপিভুক্ত করা হয়। এখানের সর্বাধিক জলপ্রবাহ 2300 কি উসেক, অপরদিকে সর্বনিম্ন জলপ্রবাহ মাত্র 15 কিউসেক। গোদাবরী নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ মে মাসে সবচেয়ে কম থাকে এবং জুলাই -আগস্ট মাসে সবচেয়ে বেশি থাকে। আগস্টের

পর জলপ্রবাহ কমলেও অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের জলপ্রবাহের পরিমাণ জানুয়ারি থেকে মে মাসের তুলনায় বেশি থাকে। গোদাবরী নদীর গড় সর্বাধিক জলপ্রবাহের পরিমাণ 3200 কিউসেক এবং সর্বনিম্ন জলপ্রবাহের পরিমাণ মাত্র 50 কিউসেক। পোলাভরমে এই জলপ্রবাহ সংগ্রহ করা হয়। জলপ্রবাহের এই পরিবর্তন চিত্র থেকে সারাবছর নদীতে জলপ্রবাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

নদীর জলের অস্থিতিশীলতার বিস্তার
(Extent of Unstability of River Water)

ভারতের নদীগুলো সারাবছর পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পরিবহণ করলেও স্থানকালভেদে তার তারতম্য ঘটে। নিত্যবহ নদীতে সারাবছর জল থাকে অপরদিকে অনিত্যবহ নদীতে শুষ্কঋতুতে জল কম থাকে। বর্ষাকালে, বন্যার ফলে প্রচুর পরিমাণ জলের অপচয় হয় এবং সমুদ্রে পতিত হয়। অনুরূপভাবে, দেশের কোনো অংশে যখন বন্যা হয় তখন কিছু কিছু স্থানে অনাবৃষ্টির ফলে খরা সৃষ্টি হয়। কেন এমনটি হয়? এটা কি জলের উৎসের উপস্থিতির সমস্যা বা পরিচালনগত সমস্যা? বন্যা নিয়ন্ত্রণে তোমরা কোনো ধারণা দিতে পারবে কি বা দেশের বিভিন্ন জায়গায় খরা প্রতিরোধে কোনো ধারণা দিতে পারবে কি? (বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে দেখো)।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বা জলের অভাব মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত জল প্রবাহযুক্ত স্থান থেকে প্রয়োজনীয় জল অন্যত্র সরবরাহ করা যায় কি? আন্তঃঅববাহিকা সংযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জান কি?

তোমরা সংবাদপত্রে নদীর সংযোগ খাল সম্পর্কে পড়েছ? তোমরা কি গঙ্গা নদীতে খাল খননের মাধ্যমে উপদ্বীপীয় নদীসমূহের জলাভাব দূর করা সম্ভব বলে মনে করো? প্রধান সমস্যাটা তাহলে কী? এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়টি পড়ো এবং অসমতল ভূমিরূপের বিভিন্ন সমস্যাগুলো খুঁজে বের কর। মালভূমি থেকে সমভূমির দিকে জল কীভাবে প্রবাহিত হয়? উত্তর ভারতের নদীসমূহের অতিরিক্ত জল কীভাবে প্রতিনিয়ত স্থানান্তর করা যায়? এসকল বিষয়ের উপর একটি বিতর্কের আয়োজন করো এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সম্পর্কে নিবন্ধ লেখো। নদীর জল ব্যবহারে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো কীভাবে উপস্থাপন করবে ?

i) পরিমিত জলের যোগান নেই
ii) নদীর জলদূষণ
iii) ঋতুভেদে জলপ্রবাহে পার্থক্য
iv) নদীজলে পলির পরিমাণ
v) বিভিন্ন রাজ্যে জলবণ্টন বিতর্ক
vi) জনসংখ্যা ও জনবসতি বৃদ্ধির ফলে নদীর খাল সংকীর্ণ হচ্ছে

নদীর জল কেন দূষিত হয়? তোমাদের শহরের নদীর জলে নোংরা পদার্থ ভেসে যেতে দেখেছ কি? শিল্প কারখানা বা বাড়ির বর্জ্য কোথায় নিক্ষিপ্ত হয়? বেশিরভাগ শ্মশান নদীর তীরে থাকে এবং অধিকাংশ সৎকারকৃত দেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের ফুল এবং প্রতিমা নদীতে বির্সজন করা হয়। আবার নদীতে স্নান করা বা কাপড় ধোয়া বা বাসন মাজার ফলে নদীর জল দূষিত হয়। কীভাবে নদীর জলকে দূষণমুক্ত করা যাবে ? তোমরা কি 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান' সম্পর্কে পড়েছ বা দিল্লিতে যমুনা নদী স্বচ্ছ করার অভিযান সম্পর্কে জান ? নদীকে দূষণমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করো এবং তার উপর একটি নিবন্ধ লেখো।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উদাহরণসহ আলোচনা করবেন -

* পেরিয়ার বিনোদন পরিকল্পনা
* ইন্দিরা গান্ধি খাল প্রকল্প
* কুর্নুল কুডাপ্পা খাল
* শতদ্রু - বিতস্তা সংযোগ খাল
* গঙ্গা - কাবেরী সংযোগ খাল

অনুশীলনী

1) **সঠিক উত্তরটি বাছাই করো -**

ক) নীচের কোন্ নদী 'বাংলার দুঃখ' নামে পরিচিত?

অ) গণ্ডক নদী আ) শোণ নদী

ই) কোশী নদী ঈ) দামোদর নদ

খ) ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকাটি কোন্ নদীতে অবস্থিত ?

অ) সিন্ধু নদ আ) ব্রহ্মপুত্র নদ

ই) গঙ্গা নদী ঈ) কৃষ্ণা নদী

গ) নীচের কোন্ নদীটি 'পঞ্চনদ'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় ?

অ) ইরাবতী আ) চন্দ্রভাগা

ই) সিন্ধু ঈ) বিপাশা

ঘ) নীচের কোন্ নদীটি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ?

অ) শোণ্ নদী আ) যমুনা নদী

ই) নমর্দা নদী ঈ) লুনি নদী

ঙ) নীচের কোন্ স্থানে অলকানন্দা এবং ভাগীরথী মিলিত হয়েছে ?

অ) বিষ্ণু প্রয়াগ আ) রুদ্র প্রয়াগ

ই) কর্ণপ্রয়াগ ঈ) দেবপ্রয়াগ

2) **নিম্নে প্রদত্ত বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখাও -**

ক) নদী অববাহিকা ও জলবিভাজিকা

খ) বৃক্ষরূপী ও জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী

গ) কেন্দ্রবিমুখ ও কেন্দ্রমুখী জলনির্গমন প্রণালী

ঘ) ব-দ্বীপ ও মোহনা

3) **নিম্নের প্রশ্নগুলোর 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও --**

ক) ভারতের নদীগুলোর আন্ত:সংযুক্তি (inter- Linking) সুবিধাগুলো কী কী ?

খ) উপদ্বীপীয় নদীগুলোর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো।

4) **নিম্নের প্রশ্নগুলোর 125টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও -**

ক) উত্তর ভারতের নদীগুলোর প্রধান প্রধান গুণগত বৈশিষ্ট্য সমূহ লেখো। এই নদীগুলো উপদ্বীপীয় নদী থেকে ভিন্নধর্মী কেন ?

খ) মনে করো, হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে তুমি হরিদ্বার থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছ। তুমি তাহলে কোন্ কোন্ নদী অতিক্রম করবে তাদের যে-কোনো একটি নদীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখো।

প্রকল্প মূলক / কাজ

পরিশিষ্ট - III পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও -

i) ভারতের কোন্ নদী অববাহিকা সর্বাধিক অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ?

ii) লেখচিত্রে তুলনামূলক স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো এবং তাতে নদীর গতিপথের দৈর্ঘ্য দেখাও।

একক
III

জলবায়ু , স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকা

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল -

* আবহাওয়া ও জলবায়ু - তাপমাত্রার স্থানগত এবং সময়গত বিন্যাস, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত; ভারতের মৌসুমি বায়ু; গঠনশৈলী আগমন ও পরিবর্তনশীলতা স্থানগত ও সময়গত : জলবায়ুর প্রকারভেদ।
* স্বাভাবিক উদ্ভিদ - অরণ্যের প্রকারভেদ ও বণ্টন; বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ; জীবমণ্ডল সংরক্ষণ।
* মৃত্তিকা - প্রধান বিভাগসমূহ ও তাদের বণ্টন, মৃত্তিকা ক্ষয় ও সংরক্ষণ।

অধ্যায়

4

জলবায়ু (Climate)

গ্রীষ্মকালে আমরা পর্যাপ্ত জল পান করি। গ্রীষ্মকালে এবং শীত-কালে তোমাদের পোশাকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। উত্তর ভারতে গ্রীষ্মকালে তোমরা হালকা পোশাক পরিধান কর এবং শীতকালে ভারী পশমের পোশাক পরিধান কর কেন? দক্ষিন ভারতে শীতকালে ভারী পশমের পোশাক প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে হালকা শীত অনুভূত হয়। ঋতুভেদে আবহাওয়াগত অবস্থার পরিবর্তন হয়। আবহাওয়োগত এই পরিবর্তন আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান (তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক, বায়ুর গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, অধঃক্ষেপণ প্রভৃতি) -এর উপর নির্ভর করে।

> আবহাওয়া হল বায়ুমণ্ডলের ক্ষণকালীন অবস্থা, অপরদিকে জলবায়ু হল কোনো নির্দিষ্ট বৃহৎ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের গড় অবস্থা। আবহাওয়া খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়, সেটা দৈনিক বা সাপ্তাহিক - উভয়ই হতে পারে, কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন অদৃশ্য এবং 50 বছর বা আরও বেশি সময় পর্যবেক্ষণের পর লিপিবদ্ধ করা হয়।

পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে তোমরা মৌসুমি বায়ু সম্পর্কে পড়েছ। 'মৌসুমি' শব্দের অর্থও জেনেছ। মৌসুমি শব্দের অর্থ হল ঋতুভেদে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন। ভারত ক্রান্তীয় মৌসুমি বায়ুর অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

মৌসুমি জলবায়ুর অখণ্ডতা ও বৈচিত্র্যময়তা (Unity and diversity in the Monsoon Climate)

ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব সর্বত্র একইরকম হয় না। আবহাওয়ার ভিন্নতা হেতু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুগত অবস্থাও ভিন্ন হয়। যেমন - ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত কেরালা ও তামিলনাড়ু এবং উত্তরে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জলবায়ুর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, যদিও প্রতিটি রাজ্যই মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত। ভারতে অঞ্চলভেদে জলবায়ুর এই পরিবর্তন সাধারণত বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতি, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, ঋতুভেদে আর্দ্রতা ও শুষ্কতার উপর নির্ভর করে। এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময়তাকে উপমৌসুমি বায়ুরূপে বর্ণনা করা হয়। এখন আমরা ওইসকল অঞ্চলের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করব।

রাজস্থানের পশ্চিমাংশে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কখনো-কখনো 55° সেন্টিগ্রেডে চলে যায়। আবার কাশ্মীরের লেহ্‌তে শীতকালে তাপমাত্রা - 45° সে (minus 45^0C) - এ নেমে যায়। রাজস্থানের চুরু-তে জুন মাসের কোনো একদিন তাপমাত্রা 50° সেন্টিগ্রেড বা তার বেশি থাকে, অপরদিকে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙ-এ (Tawang) ঐ একই দিনে তাপমাত্রা কদাচিৎ 19° সেন্টিগ্রেড থাকে। জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রাস অঞ্চলে ডিসেম্বরের কোনো এক রাতে তাপমাত্রা -45° (minus 45^0) সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়, অপরদিকে তিরুবনন্তপুরম বা চেন্নাইয়ে ওই একই রাতে 20° সে বা 22° সে তাপমাত্রা থাকে। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, ঋতুভেদে, অঞ্চলভেদে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রায় ভিন্নতা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, আমরা যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একদিনের তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করি তখন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পাব না। কেরালা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে সাত ডিগ্রি বা আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু থর মরুভূমিতে দিনের তাপমাত্রা 50° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকলেও রাতের তাপমাত্রা কমে 15° - 20° সেন্টিগ্রেডে চলে যায়।

এখন আমরা অঞ্চলভেদে অধঃক্ষেপণের তারতম্য সম্পর্কে জানব। হিমালয়ে যখনই তুষারপাত হয় ভারতের অন্যান্য প্রান্তে তখন বৃষ্টিপাত হয়। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র অধঃক্ষেপণের তারতম্যই হয় না অধঃক্ষেপণের পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায়। যেমন, মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ের চেরাপুঞ্জির অর্ন্তগত মৌসিনরামে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 1080 সেমি, অপরদিকে একই সময়ে রাজস্থানের জয়শলমীরে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 9 সেমির মতো।

মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের তুরা-তে একদিনে যতটা বৃষ্টিপাত হয় তা জয়শলমীরে 10 বছরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সমান। একদিকে যখন উত্তর-পশ্চিম হিমালয় এবং পশ্চিম মরুভূমিতে 10 সেমি-র কম, অপরদিকে মেঘালয়ে 400 সেমি-র বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

পশ্চিমে হিমালয় এবং পশ্চিমে রাজস্থানে গঙ্গার ব-দ্বীপ এবং ওড়িশার উপকূলীয় সমভূমিতে জুলাই - আগস্ট মাসের তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে প্রবল ঝড়বৃষ্টি সংঘটিত হয়। অপরদিকে করমণ্ডল উপকূল থেকে 1000 কিমি দক্ষিণে এই সময় শুষ্ক অবস্থা দেখা যায়। দেশের অধিকাংশ স্থানে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হলেও তামিলনাড়ু উপকূলে শীতের শুরুতে বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ুর এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতে মৌসুমি জলবায়ুর একটি নিজস্ব ছন্দ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রকসমূহ (Factors Determining the Climate of India)

ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রকগুলোকে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

i) অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিগত নিয়ন্ত্রক

ii) বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহজনিত নিয়ন্ত্রক

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিগত নিয়ন্ত্রক (Factors related to Location and Relief)

1) অক্ষাংশ (Latitude) তোমরা ভারতের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশগত অবস্থান সম্পর্কে জান। তোমরা আরও জান যে, কর্কটক্রান্তি রেখাটি ভারতের মাঝ বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত। এজন্য ভারতের উত্তর প্রান্ত উপক্রান্তীয় মণ্ডলের অর্ন্তগত। অপরদিকে দক্ষিণপ্রান্ত ক্রান্তীয় মণ্ডলের অর্ন্তগত। ক্রান্তীয় মণ্ডল নিরক্ষরেখার কাছাকাছি থাকায় এখানে সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং প্রতিদিন হালকা বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে অবস্থিত ভারতের উত্তরাংশ নিরক্ষরেখা থেকে দূরে অবস্থিত। এজন্য এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন এবং অধিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা নির্ধারিত হয়।

2) হিমালয় পর্বতমালা (The Himalayan Mountains) উত্তরে অত্যুচ্চ হিমালয়ের অবস্থান ভারতের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। উত্তরে হিমালয়ের এরূপ অবস্থান উত্তরের শীতল বাতাস থেকে ভারত উপমহাদেশকে রক্ষা করছে। এই ঠান্ডা ও শীতল বায়ু সুমেরু বৃত্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। আবার এই হিমালয়ের অবস্থানের ফলে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ- পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রতিহত হয়ে ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

3) স্থল ও জলভাগের বিন্যাস (Distribution of Land & water)

দক্ষিণে ভারতের তিনদিকে ভারত মহাসাগর এবং উত্তর দিকে উঁচু এবং নিরবিচ্ছিন্ন পবর্ত প্রাচীর ভারতকে বেষ্টন করে রেখেছে। স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ ধীরে ধীরে গরম বা ঠান্ডা হয়। স্থলভাগ ও জলভাগ সমভাবে উত্তপ্ত না হওয়ায় বায়ুচাপেও পার্থক্য হয়। এরফলে ভারত উপমহাদেশে ঋতুবৈচিত্র্য দেখা যায়। বায়ুচাপের এই তারতম্যের ফলে প্রত্যাবর্তিত মৌসুমি বায়ুও প্রভাবিত হয়।

4) সমুদ্র থেকে দুরত্ব (Distance from the sea)

দীর্ঘ উপকূলরেখা উপকূলীয় অঞ্চলে সাধারণত সমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়। সমুদ্র থেকে দূরে ভারতের মধ্যভাগে সমুদ্রের প্রভাব এতটা দেখা যায় না এবং ওইসকল স্থানে জলবায়ুর চরমভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য মুম্বাই এবং কোঙ্কন উপকূলে উষ্ণতা বা ঋতু বৈচিত্র্যের চরমভাব খুব কমই দেখা যায়। অপরদিকে, দেশের মধ্যভাগে সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত দিল্লি, কানপুর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায় এবং জনজীবনে তার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়।

5) উচ্চতা (Altitude) উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা হ্রাস পায়। মৃদু বাতাস, পর্বতের অবস্থানের ফলে সমভূমি অপেক্ষা পর্বতের উষ্ণতা কম থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আগ্রা এবং দার্জিলিং একই অক্ষাংশে অবস্তিত হওয়া সত্ত্বেও জানুয়ারি মাসে আগ্রা-র তাপমাত্রা 16° সে, অথচ দার্জিলিং এর তাপমাত্রা 40° সেন্টিগ্রেড।

6) ভূমিরূপ (Relief) ভারতের ভূমিরূপ ও ভূ-প্রকৃতি দ্বারা কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও বায়ুর গতিবেগ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বণ্টন প্রভৃতি প্রভাবিত হয়।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রতিবাত ঢাল এবং আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতের অনুবাত ঢালে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এই সময় শুষ্ক থাকে।

বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহজনিত কারণসমূহ (Factors Related to Air Pressure and Wind)

ভারতের জলবায়ুর স্থানগত বৈচিত্র্য জানতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত তিনটি প্রক্রিয়ার গঠনশৈলী সম্পর্কে জানতে হবে -

অ) পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের বণ্টন।

আ) বায়ুর উর্দ্ধমুখী সঞ্চালনের ফলে সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়া বিভিন্ন বায়ুপুঞ্জের অন্তঃপ্রবাহ ও জেটপ্রবাহ।

ই) অন্তঃপ্রবাহের ফলে শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমির বায়ুর ফলে ভারতে ক্রান্তীয় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এরফলে এসময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

ওপরের তিনটি প্রক্রিয়ার গঠনশৈলী দ্বারা সমগ্র দেশের শীত ও গ্রীষ্মকালের জলবায়ুগত অবস্থা বোঝা যায়।

শীতকালীন আবহাওয়াগত গঠনশৈলী (Machanism of Weather in the Winter Season)

ভূ-পৃষ্ঠস্থ বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Surface Pressure & Winds)

শীতকালে সমগ্র ভারতের জলবায়ু সাধারণত মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার বায়ুচাপ বণ্টনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শীতকালে হিমালয়ের উত্তরে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বায়ু পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপমহাদেশের উত্তরের নিম্নভূমির দিকে প্রবাহিত হয়। মধ্য এশিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত উচ্চচাপযুক্ত বায়ু শুষ্ক মহাদেশীয় বায়ুরূপে ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে এই মহাদেশীয় বায়ু আয়ন বায়ুর সাথে মিলিত হয়। যদিও সবসময় একই জায়গায় এই বায়ু পরস্পর মিলিত হয় না। কখনো-কখনো এই বায়ু আরও পূর্বে মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি পর্যন্ত শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

জেটস্ট্রিম ও উর্ধ্বাকাশে বায়ুপ্রবাহ (Jet Stream and upper Air Circulation)

উপরের এই আলোচনা থেকে বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরের ভূ-পৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ু সঞ্চালন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। অনেক উপরে ট্রপোস্ফিয়ারের নিম্ন অংশে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3 কিমি ওপরে ভিন্নধর্মী বায়ুপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্নস্থানে বায়ুমন্ডলীয় চাপে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তবে উর্ধ্বাকাশে বায়ুপ্রবাহে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে 9-13 কিমি উচ্চতায় পশ্চিমা বায়ুর প্রভাব দেখা যায়। এই বায়ু এশিয়া মহাদেশের উত্তর অক্ষাংশে হিমালয় ও তিব্বতের উচ্চভূমির সাথে প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত হয় (চিত্র 4.1)। এই বায়ুপ্রবাহ জেটপ্রবাহ বা জেট স্ট্রিম নামে পরিচিত। জেটপ্রবাহ পথে তিব্বতের উচ্চভূমি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এর ফলে জেট প্রবাহ দ্বিখণ্ডিত হয়। একটি শাখা তিব্বতের উচ্চভূমির উত্তরদিকে দিয়ে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ শাখাটি পূর্বদিকে হিমালয়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়, এর ফলে 25° উত্তর অক্ষাংশে ফেব্রুয়ারি মাসে 200-300 মিলিবার বায়ুচাপ থাকে। এটা অনুমান করা হয় যে, জেটপ্রবাহের দক্ষিণ শাখাটি ভারতে শীতাকালীন আবহাওয়া ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

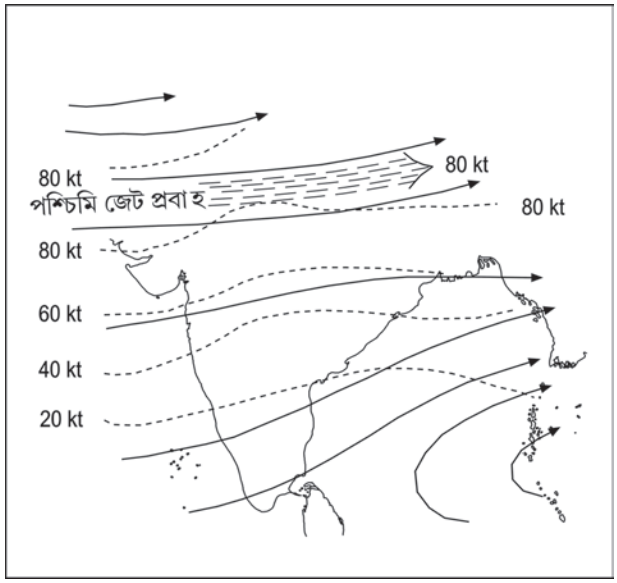

চিত্র : 4.1 শীতকালে 9-13 কিমি উচ্চতায় ভারতে বায়ুপ্রবাহের দিক

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (Western Cyclonic Disturbance and Tropical Cyclones)

ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ভারতে প্রবেশ করে; ভূমধ্যসাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমী জেটপ্রবাহরূপে ভারতে প্রবেশ করে। এই ঘূর্ণিঝড় রাতের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সাধারণত এই বায়ুপ্রবাহ বিপর্যয় আগমনের আগাম সূচনা দেয়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি হয়। এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং ভারী বৃষ্টিপাত যুক্ত হয়। এটি তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ব্যাপক আঘাত হানে দ্রুতগতি সম্পন্ন বায়ুপ্রবাহ ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে এই ঘূর্ণিঝড় ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। দূরদর্শনে আবহাওয়ার এরূপ গতিবিধি কখন দেখেছ কি?

গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার প্রক্রিয়া গঠনশৈলী (Mechanism of Weather in the Summer Season)

ভূ-পৃষ্ঠ বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Surfare Presscure & Wind): গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে সমগ্র উপমহাদেশের ওপর দিয়ে নিম্নভূমি থেকে উচ্চভূমিতে বায়ু প্রবাহিত হয়। জুলাইয়ের মধ্যভাগে, ভূ-পৃষ্ঠসংলগ্ন স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় (একে আন্ত:ক্রান্তীয় অভিসৃতি অঞ্চল - Inter Tropical Convergance Zone বলা হয়)। এই নিম্নচাপ উত্তরদিকে 20° উত্তর অক্ষাংশ থেকে 25° উত্তর অক্ষাংশে হিমালয়ের সমান্তরালে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় পশ্চিমি জেট প্রবাহ ভারত থেকে প্রত্যাহৃত হয়। আবহাওয়াবিদরা অবশ্য উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল থেকে উত্তরে স্থানান্তরিত আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি অঞ্চল (ITCZ) এর সাথে পশ্চিমী জেটপ্রবাহের আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এই সম্পর্কের একটি বিশেষ কারণ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। আন্ত:ক্রান্তীয় অভিসৃতি অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং এখান থেকে বায়ু বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রান্তীয় উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এই আর্দ্র বায়ুই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত।

জেট প্রবাহ ও ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুপ্রবাহ (Jet Stream & Upper Air Circulation)

উপরে বর্ণিত বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ শুধুমাত্র ট্রপোস্ফিয়ার স্তরেই দেখা যায় উপদ্বীপের দক্ষিণে জুনমাসে পূর্বমুখী জেটপ্রবাহ দেখা যায়, যা সর্বাধিক 90 কিমি বেগে বায়ু প্রবাহিত হয় (চিত্র 4.3) : আগস্ট মাসে এই বায়ু 15° উত্তর অক্ষাংশ এবং সেপ্টেম্বর মাসে 22° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই পুবালি বায়ু সাধারণত 30° উত্তর অক্ষাংশের উপরিস্থিত বায়ুমন্ডল অতিক্রম করতে পারে না।

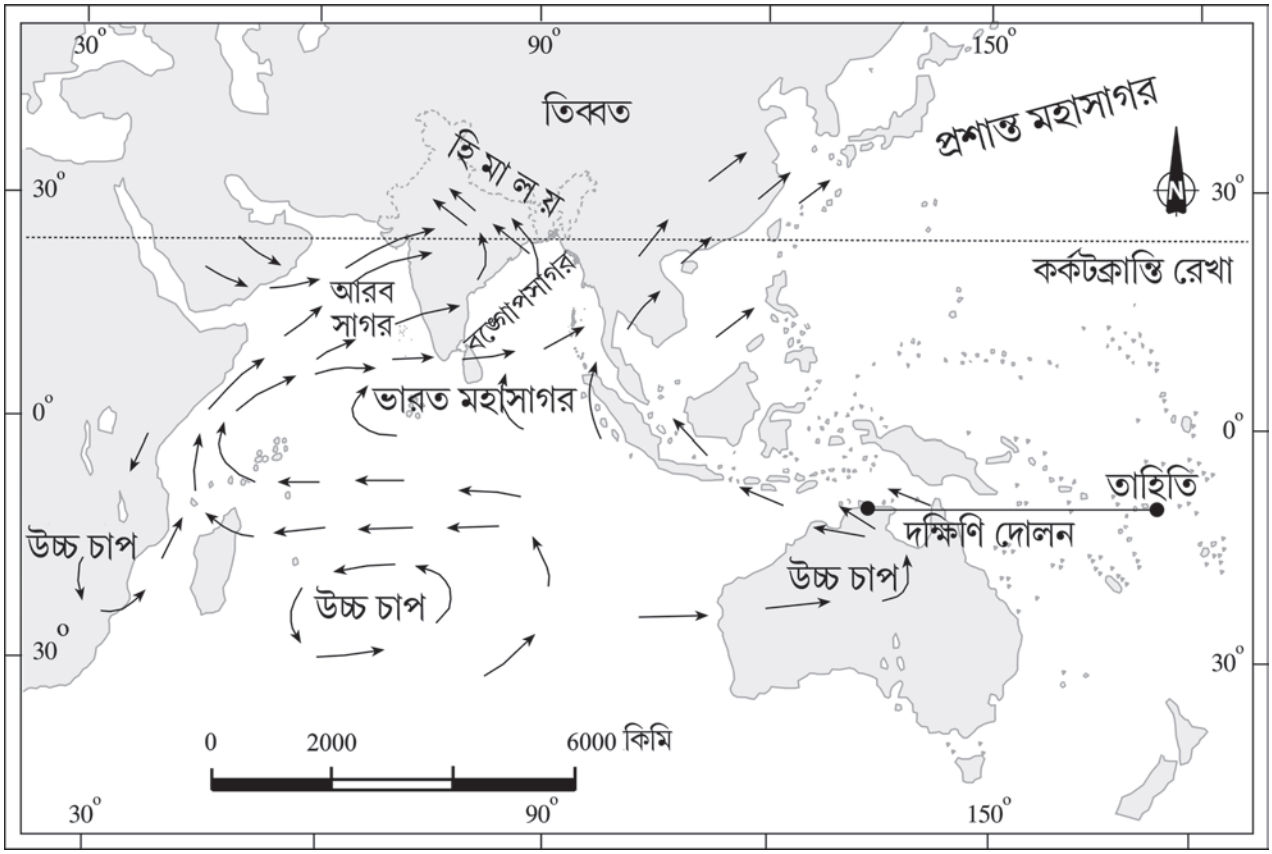

চিত্র 4.2 : গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ : পৃষ্ঠদেশীয় সঞ্চালন

আন্ত:ক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয়
(Inter Tropical Convergence Zone)

নিরক্ষরেখার ওপর নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় যেখানে আয়ন বায়ুর সাথে মিলিত হয়েছে সেখানে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় দেখা যায়। এখানে থেকে বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে প্রবাহিত হয়। জুলাই মাসে 20°-25° উত্তর অক্ষাংশে (গাঙ্গেয় সমভূমিতে)-র সন্নিহিত স্থানে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় দেখা যায়। ওইটি মৌসুমি ট্রাফ্ (Trough) নামেও পরিচিত। এই মৌসুমি ট্রাফ্-এর ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় (ITCZ) স্থানান্তরের ফলে আয়নবায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ গোলার্ধে 40°-60° পূর্ব দ্রাঘিমায় প্রবেশ করে এবং কোরিওলিস বলের প্রভাবে বায়ু দক্ষিণ- পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এটাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত। শীতকালে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় (ITCZ) দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরের ফলে প্রত্যাবর্তিত মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পরিবর্তে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত।

পুবালি জেটপ্রবাহ ও ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত
(Easterly Jetstream & Tropical Cyclones)

ভারতের ক্রান্তীয় নিম্নচাপ পুবালি জেটপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারত উপমহাদেশে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের অসমবণ্টনে এই নিম্নচাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চলে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই নিম্নচাপের গতিপথ ও প্রবলতার ওপর ভারতে নিম্নচাপের পুনরাবৃত্তি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমন ও স্থায়িত্ব, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রভৃতি নির্ভর করে।

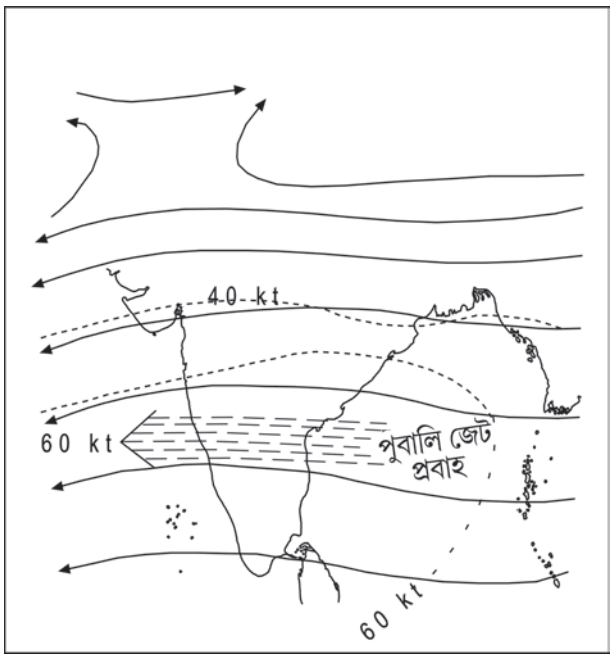

চিত্র : 4.3 গ্রীষ্মকালে 13 কিমি উচ্চতায় বায়ুপ্রবাহের দিক

ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রকৃতি
(The nature of Indian Monsoon)

জলবায়ুগত বৈচিত্র্যের জন্য মৌসুমি বায়ু বিশেষভাবে পরিচিত। শতাব্দীব্যাপী মৌসুমি বায়ুর গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আবহবিদরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। মৌসুমি বায়ুর প্রকৃতি ও গতিবিধি সঠিতভাবে অনুধাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো মতবাদ দ্বারাই মৌসুমি বায়ুর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে আঞ্চলিক স্তরের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী পর্যালোচনার ফলে সাফল্য এসেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চল সমূহের বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুচারুভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে মৌসুমিবায়ু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল -

i) মৌসুমির সূচনা বা মৌসুমি বায়ুর আগমন
ii) বৃষ্টিবহন প্রণালী (যেমন - ক্রান্তীয়, ঘূর্ণবাত) এবং তাদেরপুনরাবৃত্তি ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতের বণ্টনের মধ্যে সম্পর্ক।
iii) মৌসুমি বিরতি

মৌসুমি বায়ুর আগমন (Onset of the Monsoon)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মৌসুমি বায়ুর গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ ও জলভাগের তাপমাত্রায় পার্থক্য দেখা যায়, যা উপমহাদেশের দিকে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ুকে প্রভাবিত করে। এপ্রিল - মে মাসে কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, উত্তরের বিশাল ভূখণ্ড ভারত মহাসাগর থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলে অধিক উষ্ণ হয় । এর ফলে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ভারত মহাসাগরের

চিত্র : 4.4 মৌসুমি বায়ুর আগমন

দক্ষিণদিকে স্থলভাগ উচুঁ হওয়ায় জলভাগ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়। এই নিম্নচাপ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিম আয়নবায়ুকে প্রভাবিত করে। জলবায়ুগত এই অবস্থা আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয়কে উত্তরদিকে স্থানান্তর হতে সাহায্য করে। এজন্য নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ 40°-60° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে দিয়ে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করেছে।

আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় (ITCZ) এর স্থান পরিবর্তন উত্তর ভারতের সমভূমি, হিমালয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিমি জেটপ্রবাহ অপসারণ প্রক্রিয়ার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এই অঞ্চল থেকে পশ্চিমি জেট প্রবাহ অপসারনের পর 15° উত্তর অক্ষাংশে শুধুমাত্র পুবালি জেট প্রবাহ দেখা যায়। এই পুবালি জেট প্রবাহ ভারতে মৌসুমি বিস্ফোরণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ
(Entry of Monsoon into India)

পয়লা জুনে কেরালা উপকূলের ওপর দিয়ে দক্ষিন পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ১০-১৩ জুনের মধ্যে মুম্বাই ও কলকাতাতে পৌঁছাবে, জুলাইয়ের মধ্যভাগে দক্ষিনপশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ব্যাপ্তি সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র - ৪.৫)

বৃষ্টিবহন প্রণালী ও বৃষ্টিপাতের বণ্টন
(Rain bearing Systems & Rainfall Distribution)

সাধারণত দুটি জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভারতে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়। প্রথম শাখাটি বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয়বাষ্প বহন করে উত্তর ভারতের সমভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটায়। অপর শাখাটি আরবসাগরের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পশ্চিমঘাট পর্বতে জলীয়বাষ্প পূর্ণ মৌসুমি বায়ু প্রতিহত হয়ে উপরের দিকে ওঠে এবং অধিকাংশ শৈলোৎক্ষেপ জাতীয় বৃষ্টিপাত ঘটায়। পশ্চিম উপকূলে অধিক

এল-নিনো এবং ভারতের মৌসুমি বায়ু (EL-Nino & Indiany Moonsoon)

এল-নিনো হল আবহাওয়ার জটিল অবস্থা যা প্রতি তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে একবার সংঘটিত হয়। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে খরা, বন্যা ও অন্যান্য আবহাওয়াগত জটিল অবস্থা দেখা যায়।

এই এল-নিনো মহাসাগরীয় ও বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, এর ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বে পেরু উপকূলে উষ্ণস্রোতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়াতেও তার প্রভাব দেখা যায়।

এল-নিনো প্রসারিত হয়ে নিরক্ষীয় উষ্ণ স্রোতের সাথে মিলিত হয় যেখানে শীতল পেরুস্রোত বা হামবোল্ট স্রোত (মানচিত্র এই স্রোতগুলো চিহ্নিত করো) রূপে প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে পেরু উপকূলে জলের তাপমাত্রা 10° সেন্টিগ্রেডের মতো বৃদ্ধি পায়, এর ফলে -

i) নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার পরিবর্তন হয়।
ii) সমুদ্রের জলের বাষ্পীভবনে সমতা বজায় থাকে না।
iii) প্লাঙ্কটনের পরিমাণ কমে যায়। যার ফলে সমুদ্রে মাছের উৎপাদনও কমে যায়।

'এল-নিনো' শব্দের অর্থ 'শিশু যিশু' কারণ এই বায়ুপ্রবাহ ডিসেম্বর মাসে খ্রিস্টমাসের কাছাকাছি সময়ে হয়।

এল-নিনো ভারতে দীর্ঘকালীন মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস বহন করে। 1990-91 সালে এল-নিনোর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচ থেকে বারো দিন পিছিয়ে প্রবেশ করে।

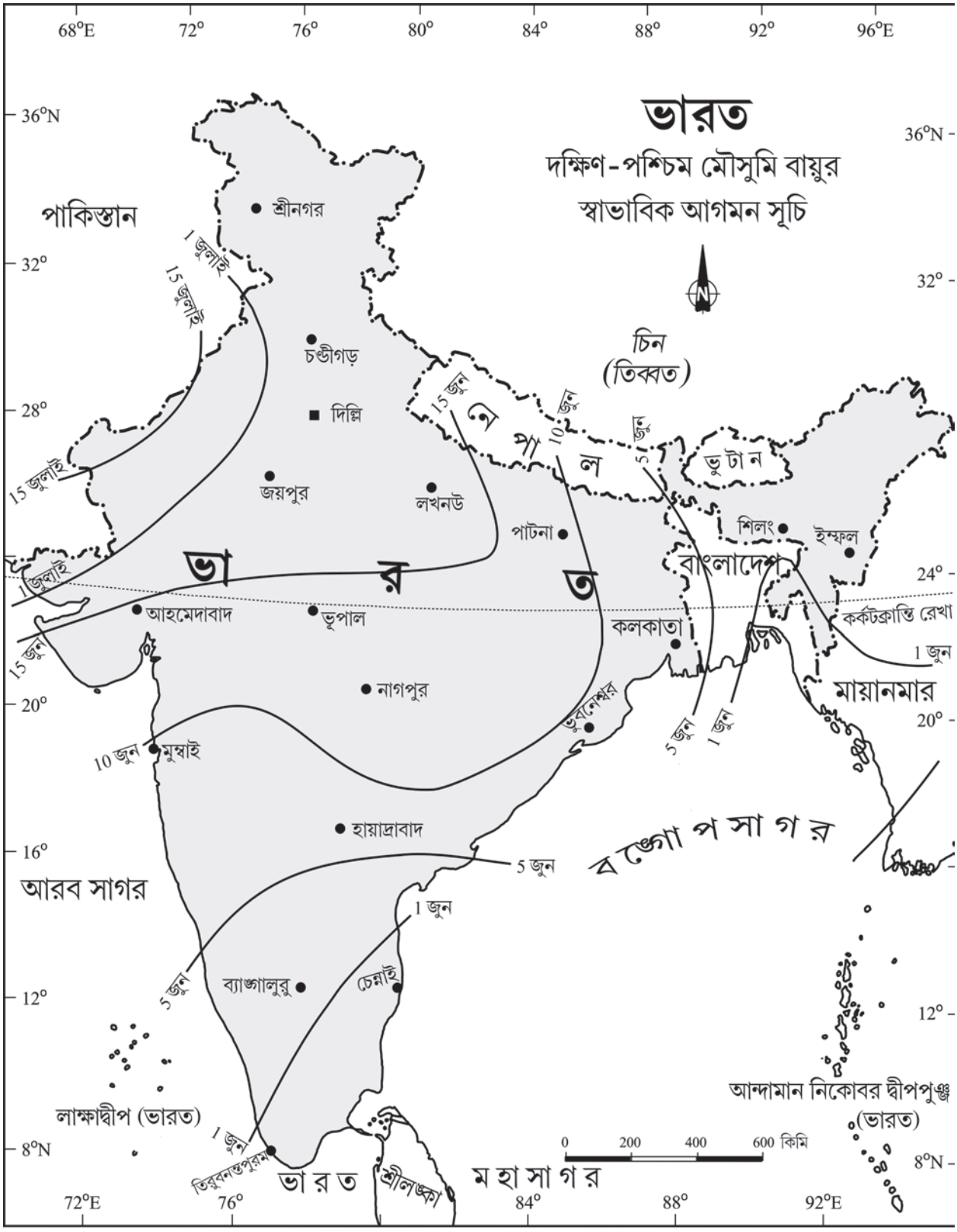

চিত্র 4.5 ভারত: দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনে প্রত্যাশিত তারিখসমূহ

বৃষ্টিপাত হওয়ার দুটো প্রধান কারণ হল -

i) সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত স্থানের আবহাওয়াগত অবস্থা।

ii) আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে নিরক্ষীয় জোট প্রবাহের অবস্থান।

বঙ্গোপসাগরে ক্রান্তীয় নিম্নচাপের উৎপত্তির ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃত বলয়ের ওপর ভারতে মৌসুমি বায়ু গতিপ্রকৃতি নির্ভরশীল যা মৌসুমি ট্রাফ (Trough) নামে পরিচিত। মৌসুমি ট্রাফের এই হেঁয়ালিপনার জন্য নিম্নচাপের দিক ও গতিপথে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বছর বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং স্থায়িত্বকালও পরিবর্তন হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিম উপকূলের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশ কমতে থাকে। আবার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম অংশসহ সমগ্র উত্তর ভারতের সমভূমি এবং উপদ্বীপের উত্তরাংশে স্বল্পকালীন বৃষ্টিপাত হয়। পেরুতে ডিসেম্বর মাসে গ্রীষ্মকাল (দক্ষিণ গোলার্ধে) থাকে।

মৌসুমি বিরতি (Break in the Monsoon)

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত হওয়ার পর যদি সেই বৃষ্টিপাত এক বা দুই সপ্তাহের জন্য বিঘ্নিত হয়, তখন তাকে মৌসুমি বিরতি বলে। বর্ষাকালে শুষ্ক দিনের স্থায়িত্ব খুব কম। এই বিরতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যেমন -

i) আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় বা মৌসুমি ট্রাফ যদি স্বল্পব্যবধানে না আসে তবে উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত সঠিক সময়ে প্রবেশ করতে পারে না।

ii) পশ্চিম উপকূলে কিছুদিনের জন্য বায়ু যখন উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত হয় তখন স্বল্প সময়ের জন্য উপকূল অঞ্চল শুষ্ক থাকে।

ঋতুপর্যায় (The Rhythm of Seasons)

বার্ষিক ঋতুচক্রের মাধ্যমে ভারতের জলবায়ুগত অবস্থার সুন্দর বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। আবহবিদগণ নিম্নলিখিত চারটি ঋতুর স্বীকৃতি দিয়েছেন -

i) শীতল শীতকাল

ii) উষ্ণ গ্রীষ্মকাল

iii) দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর আগমনকাল বা বর্ষাকাল

iv) প্রত্যাবর্তন মৌসুমি বা শরৎকাল।

শীতল শীতকাল (The Cold Weather Season)

তাপমাত্রা (Temperature) তাপমাত্রা সাধারণত নভেম্বরের মধ্যভাগ থেকে উত্তর ভারতে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস হল উত্তরের সমভূমির সর্বাধিক শীতলতম মাস। ওই সময় উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানের দৈনিক তাপমাত্রা 21°সে এর কম থাকে, রাতের তাপমাত্রাও একেবারে কমে যায়, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের তাপমাত্রা কখনো-কখনো হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়।

এই সময় উত্তর ভারতে তাপমাত্রা অত্যধিক কমে যাওয়ার তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। সেগুলো হল -

i) পাঞ্জাব, হরিয়ানা , রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থানের ফলে মহাদেশীয় জলবায়ুর প্রভাব বেশি।

ii) নিকটবর্তী হিমালয় পর্বতমালায় তুষারপাতের ফলে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং

iii) ফেব্রুয়ারি মাসে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর দিয়ে কাস্পিয়ান সাগর ও তুর্কমেনিস্তান থেকে তুষার ও কুয়াশাপূর্ণ শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়।

মৌসুমি বায়ু (Understanding the Monsoon)

ভূমিভাগ, মহাসাগর এবং বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মৌসুমি বায়ুর প্রকৃতি ও গঠনশৈলী সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা করে হয়েছে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্রান্স পলিনেশিয়ার তাহিতি (20° দ এবং 140° প) এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দর (12°30′ দ ও 131° পূ) -এর বায়ুচাপের পার্থক্যের ভিত্তিতে দক্ষিন-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর দক্ষিণী দোলনের তীব্রতা পরিমাণ করা যেতে পারে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (Indian Meteorological Department) 16 টি সূচকের মাধ্যমে মৌসুমি বায়ুর সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে।

উপদ্বীপীয় ভারতে শীতকালের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। সমুদ্রের নিকটবর্তী অবস্থান ও নিরক্ষরেখার সন্নিহিত হওয়ায় উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রা বণ্টনে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না।

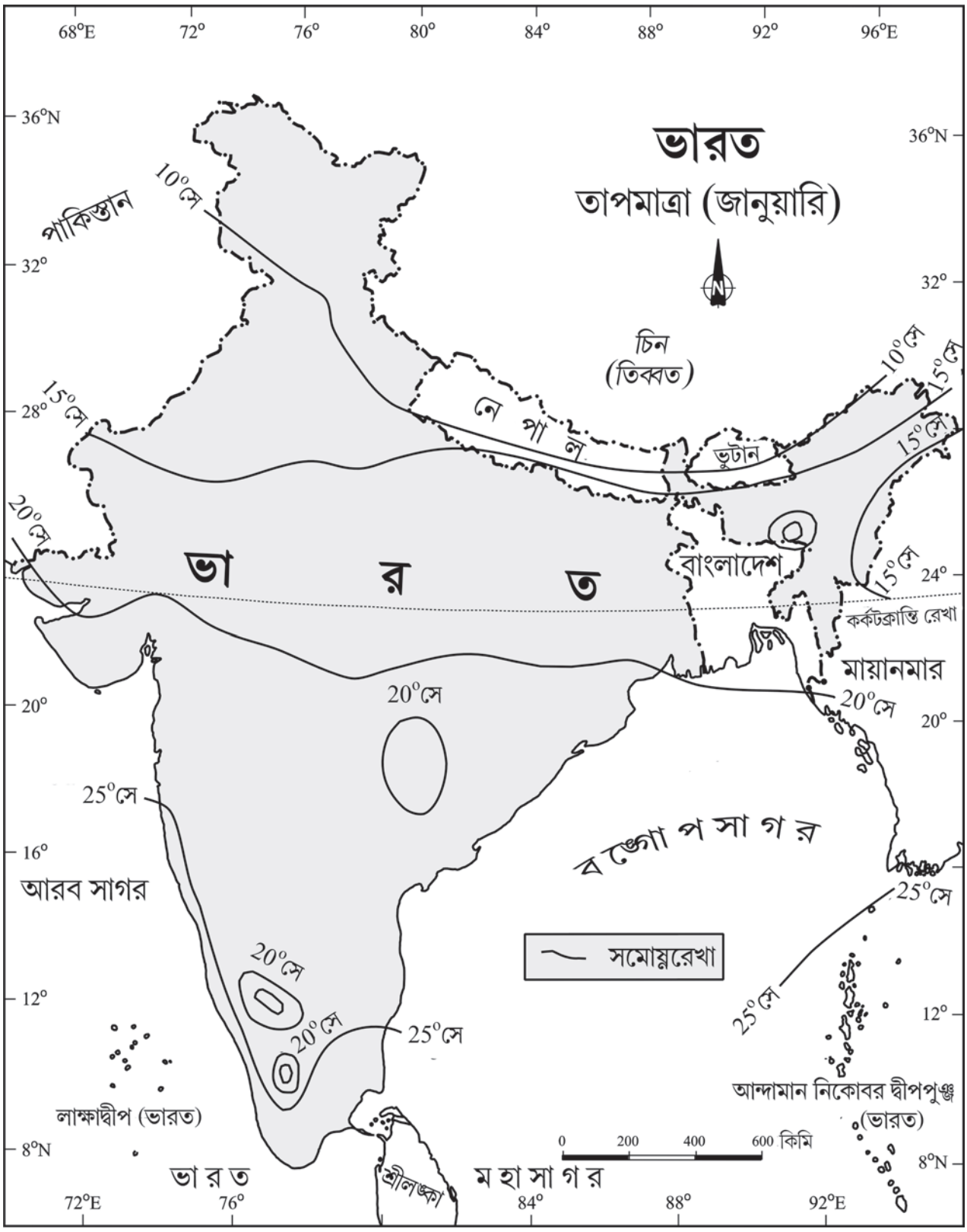

চিত্র 4.6 : ভারত : জানুয়ারি মাসের তাপমাত্রা গড় মাসিক

উদাহরণস্বরূপ, তিরুবনন্তপুরমে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা 31°সেন্টিগ্রেডের বেশি থাকে এবং জুন মাসে থাকে 29.5°সেন্টিগ্রেড। অপরদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতশৃঙ্গে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে (চিত্র - 4.6)।

বায়ুচাপ ও বায়ুচাপ প্রবাহ (Pressure & Winds)

ডিসেম্বরের শেষার্ধে (22 ডিসেম্বর) দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য মকরক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ সময় উত্তরের সমভূমিতে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তখন দক্ষিণ ভারতে বায়ুর চাপ কিছুটা কম থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বায়ুচাপ 1019 মিলিবার এবং দক্ষিণ ভারতে বায়ুচাপ1013 মিলিবার। (চিত্র 4.7)

এর ফলে, উত্তর ভারতের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

বায়ুচাপ ক্রমাগত অবনমনের ফলে ঘণ্টায় 3-5 কিমি বেগে হালকা বায়ু বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়। মোটকথা, কোনো অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সেই অঞ্চলের বায়ু প্রবাহের দিককে প্রভাবিত করে। এই বায়ু পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা বরাবর প্রবাহিত হয় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপে এই বায়ু উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। ভূ-প্রাকৃতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এই উত্তর-পূর্ব অভিমুখী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

শীতকালে ভারতে আবহাওয়া মনোরম থাকে। তবে এই মনোরম আবহাওয়ায় কখনো-কখনো ব্যতিক্রম দেখা যায়। তখন ভূ-মধ্যসাগরের পূর্বদিক থেকে অগভীর ক্রান্তীয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপযুক্ত বায়ু পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশের পূর্বে পশ্চিম এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ পথে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর থেকে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে। ভারতে নিম্নচাপ সৃষ্টিতে এই পশ্চিমি জেটপ্রবাহ কোন্ ভূমিকা পালন করে?

বৃষ্টিপাত (Rainfall)

শীতকালে স্থলভাগ থেকে বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় বৃষ্টিপাত হয় না। এর ফলে প্রথমত আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে এবং দ্বিতীয়ত স্থলভাগে প্রতীপ ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হওয়ায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে এখানে কিছু ব্যাতিক্রমও রয়েছে-

i) ভূমধ্যসাগর থেকে কিছু দুর্বল ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলেও রবিশস্যের পক্ষে খুবই উপকারি। অবহিমালয়ে এই সময় তুষারপাতরূপে অধঃক্ষেপণ হয়। এই তুষারপাতের ফলে হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলোতে গ্রীষ্মকালে জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। পশ্চিম থেকে পূর্বের সমভূমিএবং উত্তর থেকে দক্ষিণে এই অধঃক্ষেপণের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। দিল্লিতে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 53 মিলিমিটার। বিহার ও পাঞ্জাব এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে 18 মিলিমিটার ও 25 মিলিমিটার।

ii) ভারতের মধ্যভাগে ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তরাংশে শীতকালে কখনো-কখনো বৃষ্টিপাত হয়।

iii) উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আসামে শীতকালে 25-50 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

iv) অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রত্যাবর্তন উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে এবং এর ফলে তামিলনাড়ু উপকূল, অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, কর্ণাটক ও কেরালার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়।

উষ্ণ গ্রীষ্মকাল (The Hot Summer Season)

তাপমাত্রা (Temperature): মার্চ মাসে সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে কর্কটক্রান্তি রেখা সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে এবং উত্তর ভারতের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এপ্রিল, মে, জুন- এই তিন মাস উত্তরভারতে গ্রীষ্মকাল। ভারতের অধিকাংশ স্থানে এই সময় তাপমাত্রা 30°-32° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। মার্চ মাসে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে দিনের সর্বাধিক তাপমাত্রা থাকে প্রায় 38° সেন্টিগ্রেড, এপ্রিল মাসে গুজরাটের তাপমাত্রা 38° সেন্টিগ্রেড ও মধ্যপ্রদেশে 43° সেন্টিগ্রেড রেকর্ড করা হয়। মে মাসে এই তাপবলয় আরও উত্তরে অগ্রসর হয়। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা 48° সেন্টিগ্রেডের আশেপাশে থাকা অতি স্বাভাবিক ঘটনা (চিত্র : 4.8)।

দক্ষিণ ভারতে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা কম থাকে, উত্তর ভারতের মত উষ্ণতার ব্যাপকতা দেখা যায় না। উপদ্বীপীয় অবস্থান এবং সমুদ্র সন্নিহিত হওয়ার ফলে এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। তাপমাত্রা সাধারণত 26°-32° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। উচ্চতার জন্য পশ্চিমঘাট পর্বতে তাপমাত্রা 25°সেন্টিগ্রেডের কম থাকে।

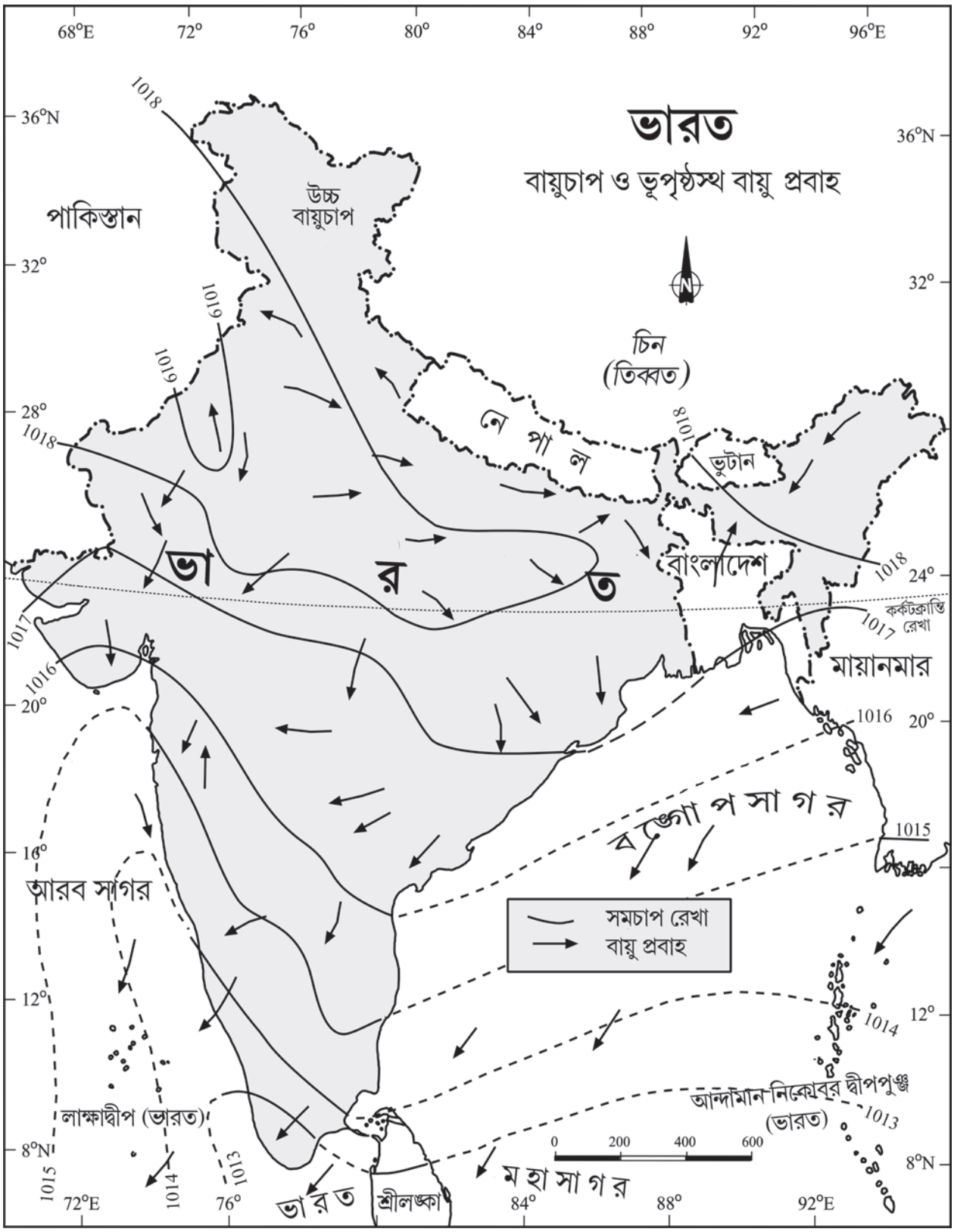

চিত্র 4.7 : ভারত : বায়ুচাপ ও ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু (জানুয়ারি)

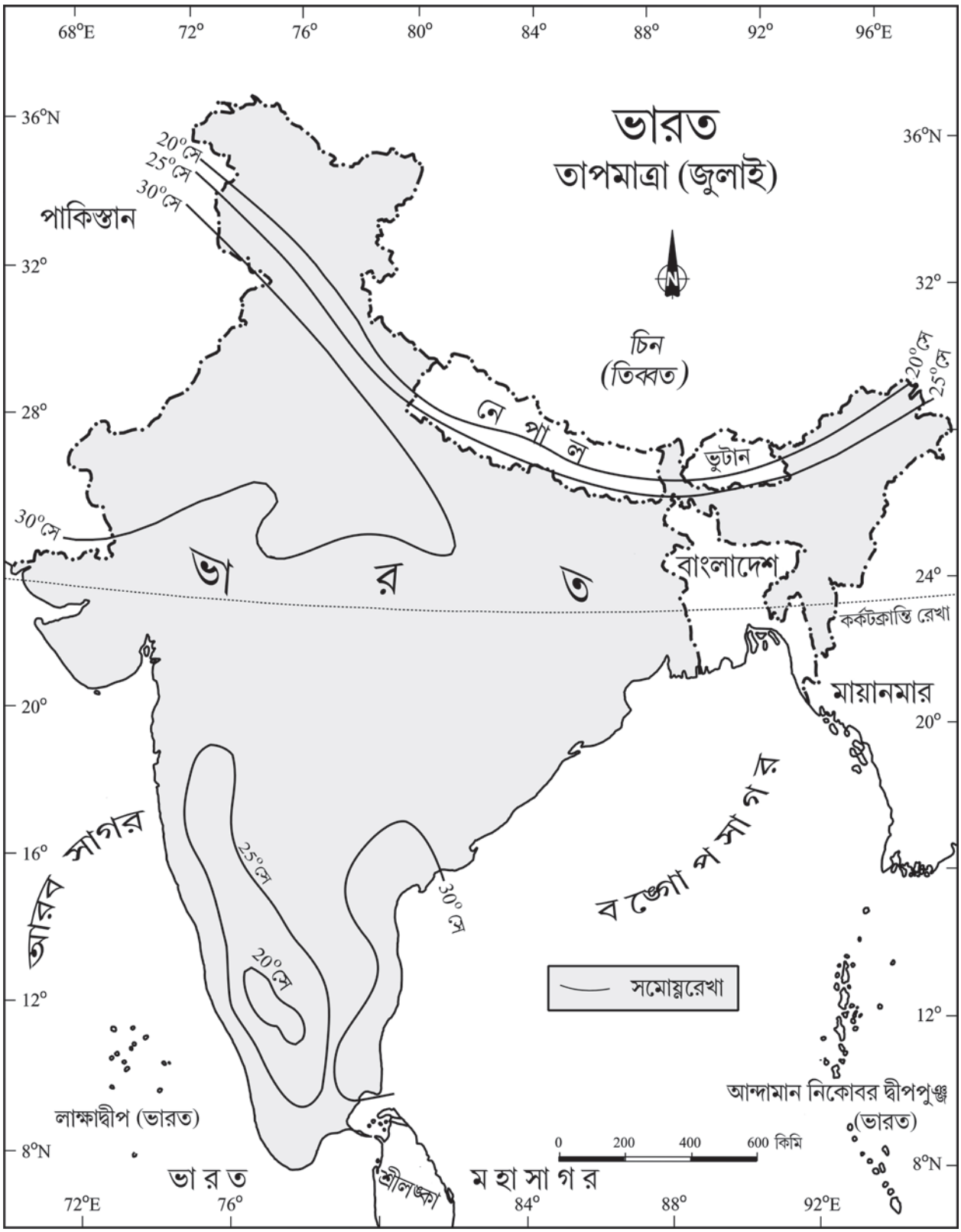

চিত্র 4.8 : ভারত : জুলাই মাসের দৈনিক গড় তাপমাত্রা।

উপকূল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণে সমোষ্ণরেখা সমূহের উপকূলের সমান্তরালে অবস্থান এটাই প্রমাণ করে যে, উত্তর থেকে দক্ষিণে তাপমাত্রা না কমলেও উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকে, কদাচিত 25°সেন্টিগ্রেডের কম হয়।

বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Pressure & Winds)

গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে বায়ুর চাপ কমে যায়। উপমহাদেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জুলাই মাসে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় (ITCZ) উত্তরদিকে 250 উত্তর অক্ষাংশ বরাবর প্রবাহিত হয়। মৌসুমি বায়ুগঠিত নিম্নচাপ প্রসারিত হয়ে থর মরুভূমির ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে পাটনা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছোটোনাগপুর মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয়ের এই অবস্থান ভূ-পৃষ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহকে প্রভাবিত করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু শুধুমাত্র পশ্চিম উপকূলকেই প্রভাবিত করে না, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলও প্রভাবিত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু উত্তরবঙ্গ ও বিহারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, নিরক্ষীয় পশ্চিমা বায়ু স্থানচ্যুত হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়েছে। জুনের মধ্যভাগে এই বায়ু আন্তঃপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হওয়ার ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে এবং বর্ষাকালের সূচনা করে।

আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয়ের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিকেলে শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, যা 'লু' নামে পরিচিত। এই অবস্থা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বজায় থাকে। এজন্য মে মাসে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পূর্ব রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে সন্ধ্যায় 'ধূলিঝড়' অতি স্বাভাবিক ঘটনা। সাময়িক এই ঝড় তীব্র দাবদাহ থেকে স্বস্তি দেয় এবং হালকা বৃষ্টিপাতও ঘটায়। ফলে আরামদায়ক বাতাস প্রবাহিত হয়, কখনো-কখনো এই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু মৌসুমি ট্রাফ (Trough)-এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুপুঞ্জের আকস্মিক সংযোগের ফলে বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং স্থানীয় ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই স্থানীয় ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বায়ুপ্রবাহ, মুষলধারে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়।

বর্ষাঋতু বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমন (The Southwest Monsoon Season)

উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। জুনের শুরুতে দক্ষিণ গোলার্ধে ভারত মহাসাগর থেকে আগত আয়নবায়ু দ্বারা এই নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হয়। দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ওপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং সমগ্র ভারতে এই বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। নিরক্ষীয় উষ্ণ স্রোত প্রবাহপথে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহন করে। নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নামে পরিচিত।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ফলে বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে প্রথম বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পায়। হঠাৎ করে এই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহের ফলে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এই বৃষ্টিপাত 'মৌসুমি বিরতি 'বা' মৌসুমি

গ্রীষ্মকালের কয়েকটি স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ (Some Famous Local Storms of Hot Weather Season)

i) **আম্রবৃষ্টি (Mango Shower) :** গ্রীষ্মের শেষে কেরালা ও কর্ণাটক উপকূলে প্রাক্-মৌসুমি বর্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা। আম পাকার প্রাক্‌মুহূর্তে এই বৃষ্টিপাত হয় বলে স্থানীয়ভাবে এই বৃষ্টি 'আম্রবৃষ্টি' নামে পরিচিত।

ii) **পুষ্পবৃষ্টি (Blossom Shower) :** এই বৃষ্টির ফলে কেরালা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে কফির মুকুল প্রস্ফুটিত হয়।

iii) **কালবৈশাখী বা পশ্চিমি ঝঞ্ঝা (Nor Westers):** পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়। এই সর্বজনবিদিত প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা বৈশাখ মাসে বেশি হয় বলে স্থানীয় নাম 'কাল বৈশাখী'। এই বৃষ্টিপাত চা,পাট ও ধানচাষের পক্ষে খুবই উপকারী। আসামে এই ঝড় 'বরদৈছিরা' (Bardoli Chheerrha) নামে পরিচিত।

iv) **লু (Loo) :** উত্তরের সমভূমি থেকে পাঞ্জাব হরিয়ানা, রাজস্থান গুজরাট উত্তরপ্রদেশে, বিহার এবং দিল্লি প্রভৃতি স্থানে দিনেরবেলা ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালে উষ্ণ, শুষ্ক ও পীড়াদায়ক বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু 'লু' নামে পরিচিত।

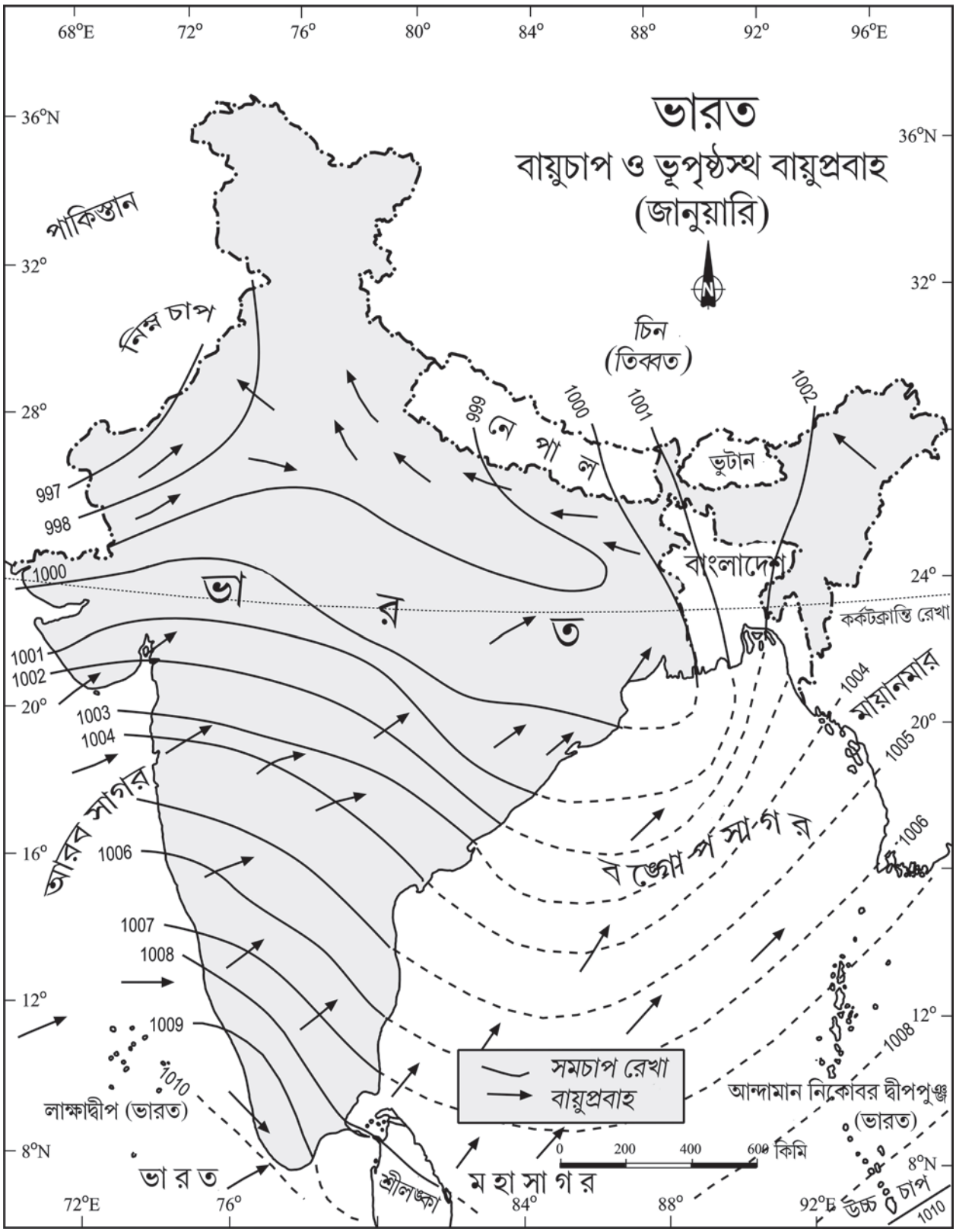

চিত্র 4.9 : ভারত : বায়ুচাপ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহ (জুলাই)

বিস্ফোরণ' নামে পরিচিত। কেরালা, কর্ণাটক, গোয়া ও মহারাষ্ট্র উপকূলে জুনের প্রথম সপ্তাহে মৌসুমি বিস্ফোরণ ঘটলেও দেশের মধ্যভাগে আরও দেরীতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মৌসুমি বিস্ফোরণ দেখা যায়। জুনের মধ্যভাগ থেকে জুলাইয়ের মধ্যভাগে দিনের তাপমাত্রা 5° সেন্টিগ্রেড থেকে 4° সেন্টিগ্রেড কম লিপিবদ্ধ করা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু স্থলভাগে প্রবেশের পথে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও উন্নতা জনিত নিম্নচাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়। দুটি শাখায় মৌসুমি বায়ু স্থলভাগে প্রভাবিত করে যেমন -

i) আরবসাগরীয় শাখা।
ii) বঙ্গোপসাগরীয় শাখা।

মৌসুমি বায়ুর আবরসাগরীয় শাখা
(Monsoon Winds of the Arabian Sea)

আরব সাগরের উপর দিয়ে মৌসুমী বায়ু তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। যথা -

i) একটি শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধাপ্রাপ্ত এই বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢাল বরাবর 900 - 1200 মিটার উচ্চতায় উঠে যায়। উপরে এই বায়ু দ্রুত শীতল হয়ে যায়। এর ফলে পশ্চিমঘাট পর্বতে সহ্যাদ্রি এর প্রতিবাত ঢাল ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 250 - 400 সেমি পশ্চিমঘাট পবর্ত অতিক্রমের পর বায়ুপ্রবাহের গতি কমে যায় এবং উন্নতা বাড়তে থাকে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। এই কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল **'বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল'** নামে পরিচিত। পুনে, কোঝিকোড়, ম্যাঙ্গালোর এবং ব্যাঙ্গালুরুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসন্ধান করো এবং তাদের পার্থক্য উল্লেখ করো (চিত্র - 4.10)।

ii) মৌসুমি বায়ুর আরব সাগরীয় অপর শাখাটি মুম্বাই উপকূলের উত্তরে প্রতিহত হয়। নমর্দা ও তাপ্তী নদী উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই শাখাটির প্রভাবে ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে 15 সেমির মতো বৃষ্টিপাত হয়। এরপর এই বায়ু প্রবাহ গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরীয় শাখার সাথে মিলিত হয়।

iii) আরবসাগরীয় মৌসুমি বায়ুর তৃতীয় শাখাটি সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ ও কচ্ছ অঞ্চলে প্রতিহত হয়। এরপর এই বায়ু পশ্চিম রাজস্থান ও আরাবল্লি পর্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং অতি অল্প পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই বায়ু বঙ্গোপসাগরীয় শাখার সাথে মিলিত হয়। পরস্পর মিলনের ফলে এই দুটি শাখা সক্রিয় হয়ে পশ্চিম হিমালয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা
(Monsoon Winds of the Bay of Bengal)

বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটি মায়ানমার উপকূল এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রতিহত হয়। কিন্তু মায়ানমার উপকূলে আরাকান পাহাড় বরাবর এই বায়ুর বৃহৎ অংশ পথ পরিবর্তন করে ভারত উপমহাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পরিবর্তে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এখান থেকে, এই বঙ্গোপসাগরীয় শাখা হিমালয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উন্নতাজনিত নিম্নচাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর একটি শাখা পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি অতিক্রম করে পাঞ্জাব সমভূমিতে পৌঁছায়। অপর শাখাটি উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়। এর উপশাখাটি মেঘালয়ের গারো ও খাসি পাহাড়ে প্রতিহত হয়। খাসি পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত **মৌসিনরামে** পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়।

এই সময় তামিলনাড়ু উপকূল কেন শুষ্ক থাকে এটা জানা বিশেষ জরুরী। দুটো প্রধান কারণ এর জন্য দায়ী। যথা -

i) দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার সাথে তামিলনাড়ু উপকূল সমান্তরালে অবস্থিত।
ii) দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরবসাগরীয় শাখার বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে তামিলনাড়ু উপকূল অবস্থিত।

মৌসুমি বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Characteristise of Monsoon Rainfall)

i) দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঋতুকালীন বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে হয়।
ii) মৌসুমি বৃষ্টিপাত ভূ-প্রকৃতি ও ভূমিরূপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ স্বরুপ, পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রতিবাত

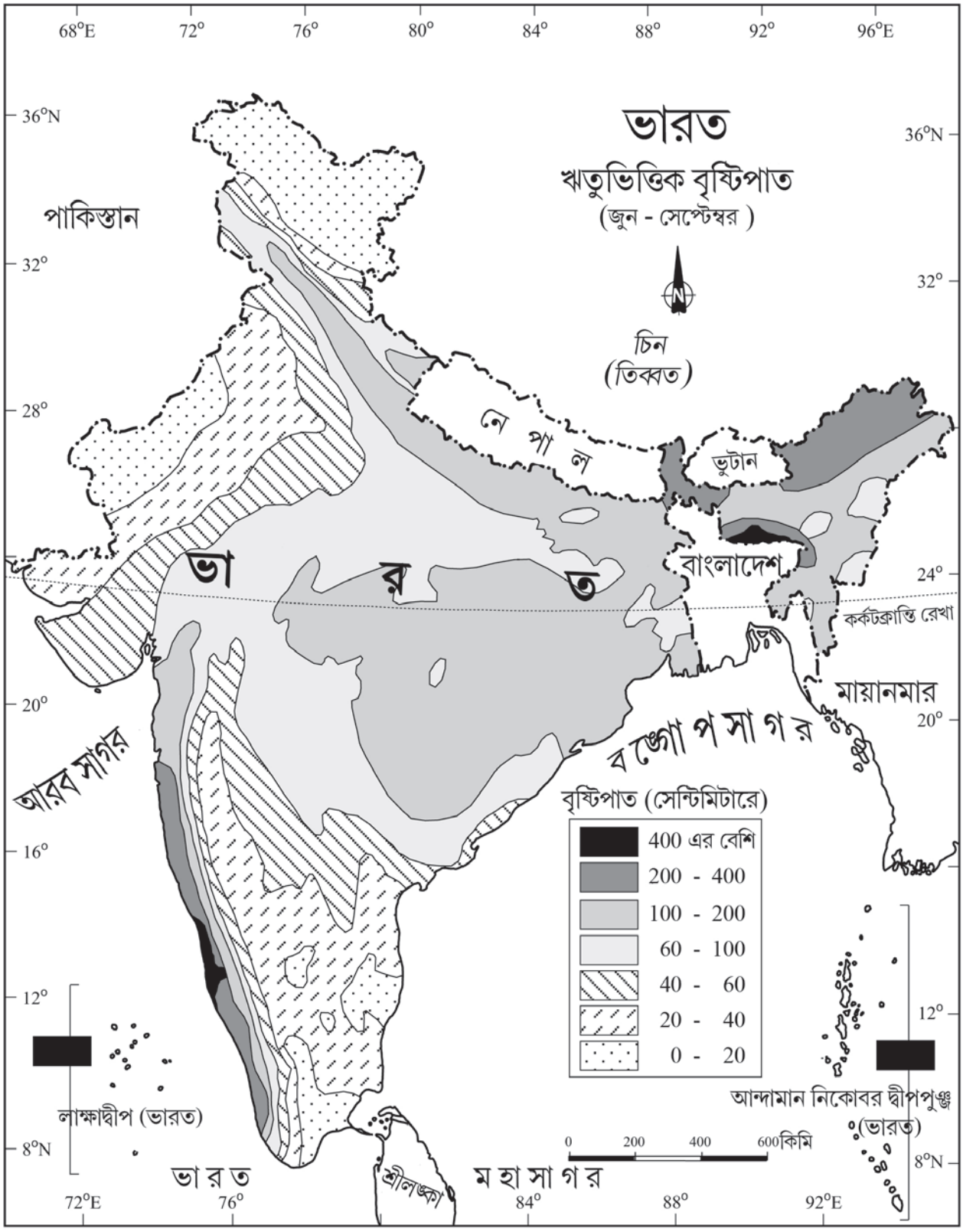

চিত্র 4.10 : ভারত : ঋতুকালীন বৃষ্টিপাত (জুন-সেপ্টেম্বর)

ঢালে 250 সেমির ওপর বৃষ্টিপাত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে পর্বতের অবস্থান ও পূর্ব হিমালয়ের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়।

iii) সমুদ্র থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কলকাতায় 119 সেমি পাটনায় 105 সেমি, এলাহাবাদে 76 সেমি এবং দিল্লিতে এই বৃষ্টিপাতের পরিমান 56 সেমি।

iv) বাতাসে আর্দ্রতার ওপর ভিত্তি করে মৌসুমি বৃষ্টিপাতও কিছু দিনের জন্য থেমে যায়। আর্দ্রবায়ুজনিত বৃষ্টিহীন এই অবস্থাকে '**মৌসুমি বিরতি**' বলে। বঙ্গোপসাগরের ওপর ঘূর্ণবাতজনিত নিম্নচাপ সৃষ্টির ফলে এই বিরতি সৃষ্টি হয় এবং মূল ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই নিম্নচাপের পুনরাবৃত্তি ও প্রাবল্যের ওপর স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে।

v) গ্রীষ্মকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিক্ষয় হয়।

vi) কৃষিনির্ভর ভারতের অর্থনীতিতে মৌসুমি বায়ু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ভারতে তিন-চতুর্থাংশ বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ফলে হয়।

vii) অঞ্চল ভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে যা 12 সেমি থেকে 250 সেমি-র বেশি হয়ে থাকে।

viii) কখনো-কখনো মৌসুমি বায়ুর দেরীতে আগমন ঘটে। ফলে সমগ্র ভারতে জুড়ে এর প্রভাব পড়ে । ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়। খরা সৃষ্টি হয়।

ix) কখনো-কখনো মৌসুমি বায়ু সময়ের আগে চলে যায়। এর ফলেও শস্যহানি ঘটে এবং শীতকালে রবিশস্য চাষে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাগমন কাল
(Season of Retreating Monsoon)

অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস **প্রত্যাবর্তিত মৌসুমি** নামে পরিচিত। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্চ মাসে সূর্যের দক্ষিণায়নের ফলে গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর থেকে নিম্নচাপ ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে রাজস্থানের পশ্চিমাংশ থেকে মৌসুমি বায়ুর পশ্চাদপসরণ শুরু হয় এবং মাসের শেষে গাঙ্গেয় সমভূমি থেকেও অপসারিত হয়, অক্টোবরের শুরুতে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং নভেম্বরের শুরুতে এই বায়ু কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডিসেম্বরের মধ্যভাগে উপদ্বীপ থেকে নিম্নচাপের কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমনের ফলে আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, ভূমিভাগও আর্দ্র থাকে। উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে আবহাওয়া পুনরায় অস্বস্তিকর হয়। এটা 'অক্টোবর তাপ' (October heat) নামে পরিচিত। অক্টোবরের শেষার্ধে বিশেষত উত্তর ভারতে তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে। প্রত্যাবর্তিত মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারত শুষ্ক থাকলেও উপদ্বীপের পূর্বদিকে ওইসময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য এখানে অক্টোবর ও নভেম্বর মাস হল বছরের বৃষ্টিবহুল মাস।

আন্দামান সাগরে ঘূর্ণবাতজনিত নিম্নচাপ সৃষ্টির ফলে এই সময় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় এবং উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে পূর্ব উপকূলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় মারাত্মক ধ্বংসাত্মক হয়। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী আবহবিকার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি থাকে। প্রতিবছর এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে এখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলভাগ বাংলাদেশ এবং মায়ানয়ারে এই ঝড়ের কিছুটা প্রভাব পড়ে। এই ঘূর্ণবাতজনিত নিম্নচাপের ফলে করমণ্ডল উপকূলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। তবে এরুপ ক্রান্তীয় ঝড় আরবসাগরে এতটা দেখা যায় না।

ভারতে ঋতু পরম্পরা
(Trading India Seasons)

ভারতের পরম্পরা অনুযায়ী ঋতুগত দিক থেকে ছয়টি ঋতু পর্যায় দেখা যায়। প্রতি দুমাস অন্তর-অন্তর এই ঋতুপর্যায় হয়। উত্তর ও মধ্যভারতের দীর্ঘকালীন ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা ও বৃষ্টিপাতের নিরীখে এই ঋতুপর্যায় সর্ম্পকে ধারণা লাভ করা হয় তবে দক্ষিণ ভারতে এই ঋতুপর্যায় অস্পষ্ট, সেখানে অতি সাধারণ পার্থক্য দেখা যায়।

ঋতু	মাস আঞ্চলিক ক্যালেন্ডার অনুসারে	মাস ভারতীয় ক্যালেন্ডার অনুসারে
বসন্ত	চৈত্র - বৈশাখ	মার্চ - এপ্রিল
গ্রীষ্ম	জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়	মে - জুন
বর্ষা	শ্রাবণ - ভাদ্র	জুলাই - আগস্ট
শরৎ	আশ্বিন - কার্তিক	সেপ্টেম্বর - অক্টোবর
হেমন্ত	অগ্রহায়ন - পৌষ	নভেম্বর - ডিসেম্বর
শীত	মাঘ - ফাল্গুন	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি

বৃষ্টিপাতের বণ্টন (Distribution of Rainfall)

ভারতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় 125 সেমি হলেও এই বৃষ্টিপাত সবর্ত্র সমানভাবে হয় না (চিত্র - 4.11)।

অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (Areas of High Rainfall):

পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্যাঞ্চল (হিমালয়ের অংশবিশেষ) এবং মেঘালয় পাহাড়ে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এখানে বৃষ্টিপাত 200 সেমি-র বেশি হয়, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের কিছু অংশে এই বৃষ্টিপাত 1000 সেমি-র বেশি হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাসহ সন্নিহিত পাহাড়ে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 200 সেমি-এর কম থাকে।

মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (Areas of Medium Rainfall)

গুজরাটের দক্ষিণাংশ, তামিলনাড়ুর পূর্বাংশ, উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বাংশের ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশের পূবার্ংশ, হিমালয় সন্নিহিত উত্তর গাঙ্গেয় সমভূমি, কাছাড় উপত্যকা ও মণিপুরে 100-200 সেমির মতো বৃষ্টিপাত হয়।

স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (Areas of Low Rainfall)

উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 50-100 সেমি।

অত্যল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (Area of Inadequate Rainfall)

উপদ্বীপের কিয়দংশ বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র, লাডাক এবং পশ্চিম রাজস্থানের অধিকাংশ স্থানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 50 সেমির কম থাকে। শুধুমাত্র হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলেই তুষারপাত হয়।

বৃষ্টিপাতের মানচিত্র দেখে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ধরন চিহ্নিত করো।

বৃষ্টিপাতের অসমবণ্টন (Variability of Rainfall):

বৃষ্টিপাতের অসমবণ্টন ভারতীয় বৃষ্টিপাতের একটি বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিপাতের এই অসমবণ্টনকে নিম্নে প্রদত্ত সূত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় -

বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে বৃষ্টিপাতের গুণগত পরিবর্তন দেখানো হয়। কোনো কোনো স্থানে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 25-50 শতাংশ কমে যায়। গুণগত মানের বৈচিত্র্যের জন্য ভারতে বৃষ্টিপাতের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিম উপকূল, পশ্চিমঘাট পবর্ত, উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বাংশ, পূর্ব গাঙ্গেয় সমভূমি, উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তরাঞ্চল ও হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 25 শতাংশেরও কম বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

$$\text{গুণগত পরিবর্তন (Cofficient of Rainfal)} = \frac{\text{ব্যত্যয় প্রমাণ (Standard deviation)}}{\text{গড় (Mean)}} \times 100$$

এই সকল অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 100 সেমির ওপর থাকে। রাজস্থানের পশ্চিমাংশ, জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরাংশ এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে 50 শতাংশের বেশি পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়। এই সকল অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 50 সেমির কম, ভারতের অন্যান্য অংশে এই পরিবর্তনশীলতা 25-50 শতাংশ থাকে এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 50-100 সেমি (চিত্র - 4.12)।

ভারতের জলবায়ু অঞ্চল (Climatic Regions of India)

সমগ্র ভারতবর্ষ মৌসুমি জলবায়ুর অর্ন্তভুক্ত। আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় সত্ত্বেও অনেক আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে উপ-মৌসুমি প্রকৃতির জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। সমপ্রকৃতির উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলে সমপ্রকৃতির জলবায়ু দেখা যায়। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত হল দুটো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার দ্বারা কোনো অঞ্চলের জলবায়ু নির্ধারিত হয়। জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ যদিও একটি জটিল প্রক্রিয়া, তাসত্ত্বেও জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এর মধ্যে কোপেন (Koppens Scheme) কৃত জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ ভারতে বিশেষভাবে সমাদৃত। নিম্নে কোপেন-এর জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ বণর্না করা হল :

মাসিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে কোপেন ভারতে জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ করেছেন তিনি ভারতকে পাঁচটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হল -

i) ক্রান্তীয় জলবায়ু - যেখানে সারাবছর ধরে গড় মাসিক তাপমাত্রা 18° সেন্টিগ্রেডের বেশি থাকে।

ii) শুষ্ক জলবায়ু - যেখানে উষ্ণতার তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। এজন্য আবহাওয়া শুষ্ক থাকে, শুষ্কতার পরিমাণ কম থাকলে সেখানকার জলবায়ু নাতিশুষ্ক (Semi arids) এবং শুষ্কতার পরিমাণ বেশি থাকলে শুষ্ক (Arid-W) জলবায়ু দেখা যায়।

iii) উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু - যে সকল স্থানে শীতলতম মাসের তাপমাত্রা 18° সেন্টিগ্রেড থেকে - 3° সেন্টিগ্রেড (minus 3°C)থাকে সেখানে উষ্ণক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়।

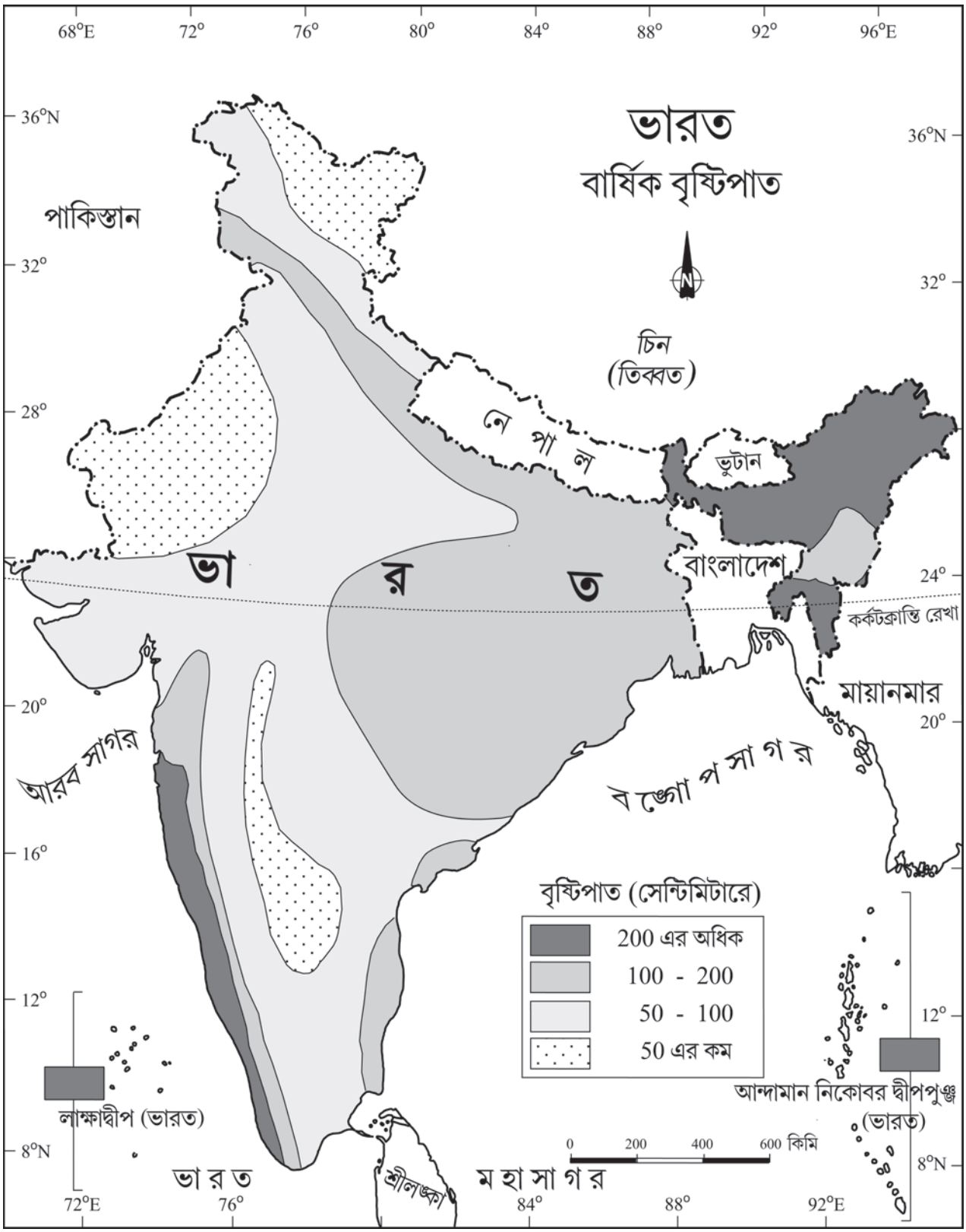

চিত্র 4.11 : ভারত : বার্ষিক বৃষ্টিপাত

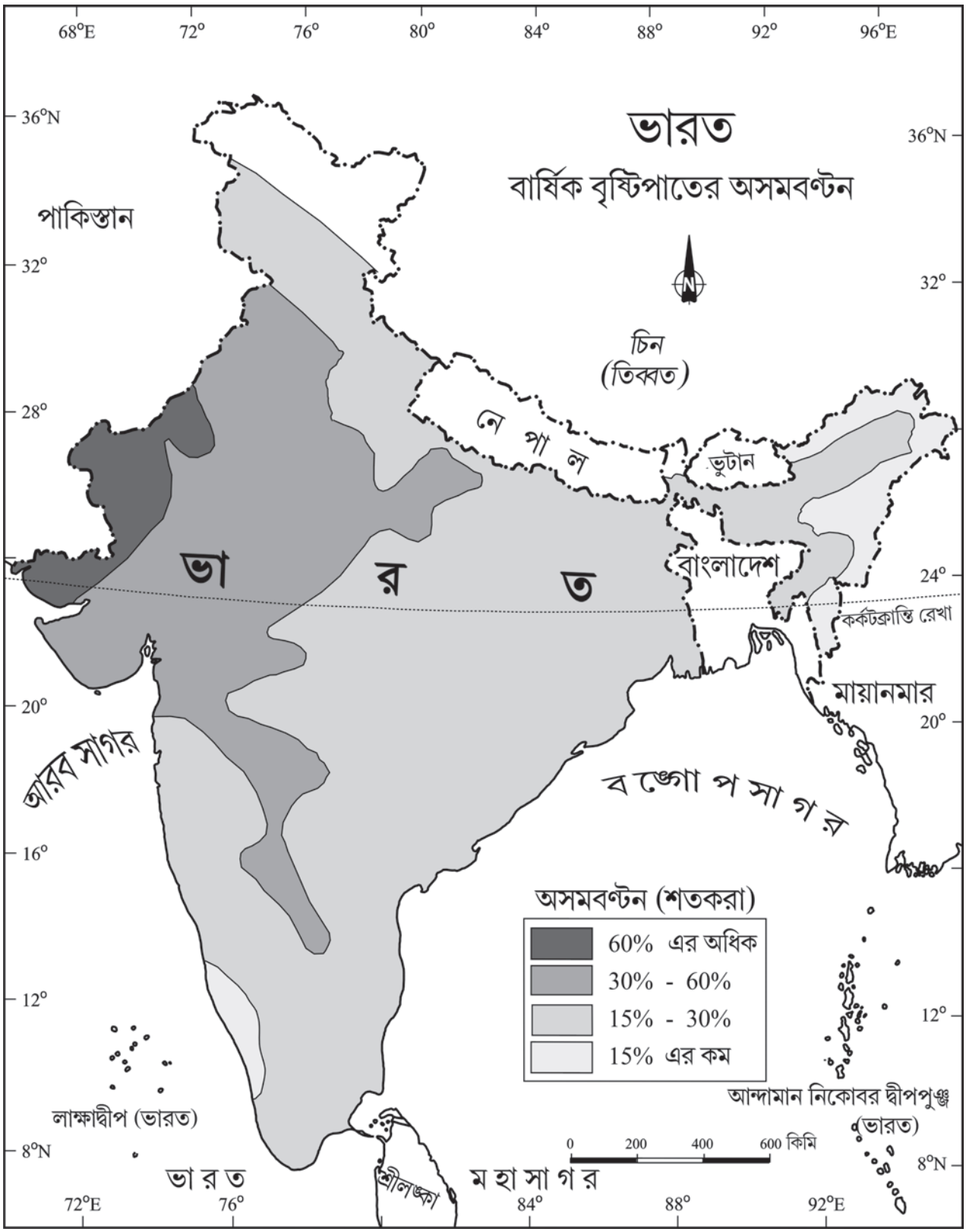

চিত্র 4.12 : ভারত : বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা

iv) শীতল ক্রান্তীয় জলবায়ু - যেসকল স্থানে উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা গড় 10° সেন্টিগ্রেডের ওপর থাকে এবং শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা 3° সেন্টিগ্রেডের (minus-3°C) কম থাকে সেখানে শীতল ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়।

v) শীতল জলবায়ু - যেখানে উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা 10° সেন্টিগ্রেডের নীচে থাকে সেখানে শীতল জলবায়ু দেখা যায়।

কোপেন তাঁর এই জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগে শুধুমাত্র হরফ ব্যবহার করেছেন। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের বণ্টনের ওপর ঋতুবৈচিত্র্য দেখা যায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগকে আবার উপবিভাগে ভাগ করা হয়। তিনি 'S' হরফ দিয়ে নাতি শুষ্ক এবং 'W' দিয়ে শুষ্ক জলবায়ুকে নির্দেশ করেছেন। আবার পরিমিত বৃষ্টিপাত বোঝাতে 'f' এবং 'm' দিয়ে শুষ্ক মৌসুমি ঋতুর বৃষ্টিবহুল অরণ্য, 'W' শুষ্ক শীতকাল, 'h' শুষ্ক ও উষ্ণ, 'c' হল কোনো অঞ্চলে চারমাসব্যাপী গড় তাপমাত্রা 10° সেন্টিগ্রেডের ওপর থাকে এবং 'g' হল গাঙ্গেয় সমভূমি। সেই অনুযায়ী ভারতের জলবায়ু অঞ্চলকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়। (সারনী - 4.1 এবং চিত্র - 4.13)।

iii) ফসলে বৈচিত্র্য - অঞ্চলভেদে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে ফসলেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

iv) প্রাকৃতিক দুযোর্গ - বৃষ্টিপাতের অসমবণ্টনের ফলে দেশের কিছু কিছু অংশে খরা বা বন্যার সৃষ্টি হয়।

v) ফসল উৎপাদনে - মৌসুমি বায়ুর নির্দিষ্ট সময়ে আগমন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ওপর ভারতে কৃষিজ ফসলের উৎপাদণ নির্ভর করে। যদি নির্দিষ্ট সময়ে মৌসুমি বায়ুর আগমন না ঘটে তবে জলসেচের সুবিধাহীন অঞ্চলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।

vi) মৃত্তিকার প্রভাব - মৌসুমি বায়ু দ্বারা অতিবর্ষণের ফলে ভারতের অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকাক্ষয় দেখা যায়।

vii) রবিশস্য উৎপাদনে - শীতকালে উত্তর ভারতে সৃষ্টি ক্রান্তীয় ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে শীতকালীন বৃষ্টিপাতে খুবই সুবিধে হয় রবিশস্য উৎপাদনে।

viii) জীবনধারণ প্রণালীতে - জলবায়ুর তারতম্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসগৃহ নির্মাণকেও প্রভাবিত করে।

সারণি 4.1 কোপেন কৃত ভারতের জলবায়ু অঞ্চল
(Climatic Regions of India According to Koppens Scheme)

জলবায়ুর প্রকৃতি	প্রভাবিত অঞ্চল
1) ক্রান্তীয় অতি আর্দ্র মৌসুমি অঞ্চল (Amw)	ভারতের পশ্চিম উপকূল, গোয়ার দক্ষিণাংশ
2) ক্রান্তীয় শুষ্কগ্রীষ্ম ও শীতকালীন বৃষ্টিবহুল অঞ্চল(As)	তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূল
3) ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল(Aw)	উপদ্বীপীয় মালভুমির অধিকাংশ স্থান, কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণাংশ
4) ক্রান্তীয় মরুপ্রায় এবং উপক্রান্তীয় স্টেপ অঞ্চল(Bshw)	গুজরাটের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ
5) উষ্ণ মরু অঞ্চল (Bwhw)	রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্ত
6) আর্দ্র উপক্রান্তীয় মৌসুমি (শুষ্ক শীত) অঞ্চল(Cwg)	গাঙ্গেয় সমভূমি, রাজস্থানের পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ, উত্তর-পূর্ব ভারত অরুণাচল প্রদেশ
7) নাতিশীতোষ্ণ মৃদু গ্রীষ্ম ও আর্দ্র শীতল অঞ্চল(Dfc)	জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড
৮) শীতল পার্বত্যাঞ্চল বা মেরু অঞ্চলে(E)	

ভারতের অর্থনীতি ও জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব (Monsoons and the Economic Life in India)

i) জীবিকা নির্বাহ - মৌসুমি বায়ু হল ভারতীয় কৃষির মূল ভিত্তি, কারণ দেশের প্রায় 64 শতাংশ অধিবাসী জীবন ধারণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতের কৃষিকে প্রভাবিত করে।

ii) স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর - হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল ছাড়া ভারতের সমগ্র অংশে সারাবছর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে বিভিন্ন ধরনের ফসল ও উদ্ভিদ জন্মায়।

ভূ-উষ্ণায়ন (Global Warming)

তোমারা জান যে, প্রকৃতির নিয়মেই সব পরিবর্তিত হয়। জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য থেকে অতীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানা যায়। এই পরিবর্তন এখনও চলছে কিন্তু বর্তমানে এই পরিবর্তন অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এই ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, 'প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব, ভাগ -1 (Fundanmental of Physical Geography NCERT, 2006 বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূ-তাত্ত্বিক সময়সূচী দেখো)। কোনো এক সময় পৃথিবীর ব্যাপক অংশ বরফাবৃত ছিল। তোমরা ভূ-উষ্ণায়ন

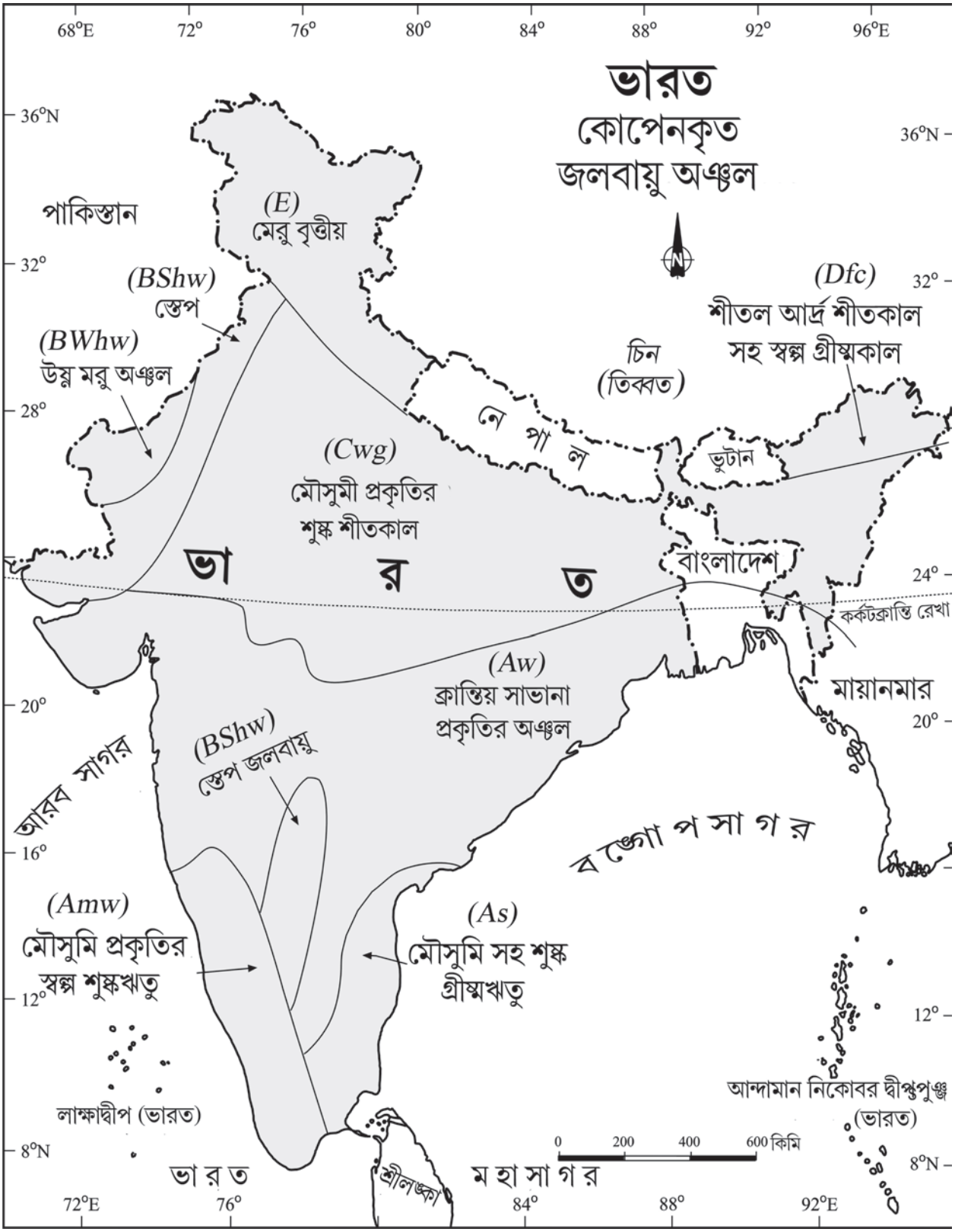

চিত্র 4.13 : ভারত : কোপেনকৃত জলবায়ু অঞ্চলসমূহ

সম্পর্কে পড়েছ বা বির্তক শুনেছ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানুষের অসংযত কার্যাবলি যেমন - প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা স্থাপন এবং বায়ুমণ্ডলে দূষিত গ্যাসের উপস্থিতিও ভূ-উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। তোমরা ভূ-উষ্ণায়ন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় 'গ্রিন হাউজ প্রভাব' সম্পর্কে শুনে থাকবে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ফলেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। এগুলো ছাড়া মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন এবং নাইট্রাস অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে খুব কম পরিমাণ রয়েছে। এগুলোকে একত্রে **গ্রিন হাউস গ্যাস বলে**। এই গ্যাসগুলো কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে বেশি দীর্ঘ তরঙ্গগুলো শোষণ করে এবং গ্রিন হাউজ প্রভাবকে আরও বৃদ্ধি করে। এ গ্যাসগুলোভূ-উষ্ণায়নে সাহায্য করে। ভূ-উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ এবং পবর্তশৃঙ্গের বরফ দ্রুত গলছে। এর ফলে সাগর মহাসাগরের জলরাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত 150 বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় বাষির্ক তাপমাত্রা থেকে বর্তমানে তাপমাত্রা বেড়েছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, 2100 সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় 2°সেন্টিগ্রেড বাড়বে। তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির ফলে অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে, এর একটি হল, হিমবাহ এবং মেরুসাগরের বরফ গলনের ফলে সাগর মহাসাগরের জলের স্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একুশ শতকের শেষে সমুদ্রজলের উচ্চতা 48 সেমি বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বাষির্ক বন্যার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ুর পরিবর্তনে কীটবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন ম্যালেরিয়া দেখা দেবে। আবার জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে কোনো জায়গায় আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাবে, কোথাও শুষ্কতা বেড়ে যাবে, কৃষিপদ্ধতি পরিবর্তিত হবে এবং জনসংখ্যার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাস্তুতন্ত্রও পরিবর্তিত হবে। ভারতের উপকূলসমূহে বর্তমান সময় থেকে সমুদ্রজলস্তরের উচ্চতা 50 সেমি বৃদ্ধি পেলে কী হবে?

অনুশীলনী

১) **নীচে প্রদত্ত চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো -**

ক) শীতকালে তামিলনাড়ু উপকূলে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণ কী?

অ) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আ) ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়

ই) উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু ঈ) স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ

খ) ভারতের কত অনুপাত অঞ্চলে বাষির্ক গড় বৃষ্টিপাত 75 সেমির কম থাকে?

অ) অর্ধেক অংশে আ) দুই-তৃতীয়াংশে

ই) এক-তৃতীয়াংশে ঈ) তিন-চতুর্থাংশে

গ) নীচের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় না?

অ) এখানে দৈনিক তাপমাত্রার প্রসার কম থাকে

আ) এখানে বাষির্ক তাপমাত্রার প্রসার কম থাকে

ই) সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে

ঈ) জলবায়ু চরমভাবাপন্ন থাকে

ঘ) দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য মকরক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দিলে আবহাওয়াগত কী কী পরিবর্তন দেখা যায়?

অ) তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়।

আ) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

ই) উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা ও বায়ু চাপের পরিবর্তন হয় না।

ঈ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'লু' প্রবাহিত হয়।

ঙ) ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে কোপেন কৃত জলবায়ু বিভাজনের As প্রকৃতির জলবায়ু দেখা যায়?

অ) কেরালা ও কর্ণাটক উপকূল আ) আন্দামান ও নিকোবোর

ই) করমণ্ডল উপকূল ঈ) আসাম ও অরুণাচল প্রদেশ

২) **নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও:**

ক) ভারতের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে এমন তিনটি প্রধান উপাদানের বর্ণনা দাও।

খ) আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয় (Inter - Tropical Convergonee Zone) বলতে কী বোঝ।

গ) 'মৌসুমি বিস্ফোরণ' বলতে কী বোঝ। ভারতের কোথায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়?

ঘ) 'জলবায়ু অঞ্চল' -এর সংজ্ঞা দাও। কোপেন কৃত জলবায়ুর ভিত্তিগুলো কী কী?

ঙ) শীতকালে কোন্ ঘূর্ণবাতের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টিপাত হয়? এই ঘূর্ণবাত কোথা থেকে উৎপন্ন হয়?

৩) **নিচের প্রশ্নগুলোর 125 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও-**

অ) 'জলবায়ুগত বিশাল সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও অঞ্চলভেদে ভারতের জলবায়ুতে বৈচিত্র্য দেখা যায়- যথাযথ উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করো।

আ) ভারতের আবহাওয়াগত বিভাগ অনুসারে ভারতে কত প্রকার ঋতুপর্যায় দেখা যায়?যে-কোনো একটি ঋতুর আবহাওয়াগত অবস্থা বণর্না করো।

প্রকল্প মূলক কাজ

ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখাও -

ক) শীতকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল।

খ) গ্রীষ্মকালে বায়ুপ্রবাহের দিক।

গ) যেসকল অঞ্চলে 50 শতাংশের বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

ঘ) যে সকল অঞ্চলে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা 15° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম থাকে।

ঙ) 100 সেমি-র সমবর্ষণ রেখা।

অধ্যায়

5

স্বাভাবিক উদ্ভিদ
Natural Vegetation

তোমরা কি কখন বনাঞ্চলে বনভোজনে গিয়েছ? শহরে থাকলে তোমরা অবশ্যই পার্কে গিয়েছ বা গ্রামে থাকলে আম, পেয়ারা বা নারকেল বাগান দেখেছ। তাহলে তোমরা স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং গ্রথিত উদ্ভিদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করবে? প্রাকৃতিক পরিবেশে বনভূমিতে যে প্রজাতির বৃক্ষ দেখা যায়, একই প্রজাতির উদ্ভিদ মানুষের তত্ত্বাবধানে তোমাদের বাগানেও তা দেখা যায়।

দীর্ঘদিন মানুষের সংস্পর্শ বর্জিত হয়ে প্রকৃতির কোলে যেসকল উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে, সেগুলোকে স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে। জলবায়ু এবং মৃত্তিকার ওপর স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ভর করে।

ভারতে বিভিন্ন প্রজাতির স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায়। ভূ-প্রকৃতির ওপর স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ভর করে। হিমালয়ের উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষ, পশ্চিমঘাট পর্বত এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য, ব-দ্বীপ অঞ্চলে পর্ণমোচী ও ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ, মরুভূমি ও রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলে ক্যাকটাস, কাঁটা ও ঝোপঝাড়জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। জলবায়ু ও মৃত্তিকার ওপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, ভূ-প্রকৃতি ও উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

বনভূমির শ্রেণিবিভাগ (Typers of Forest)

i) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং মিশ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি
ii) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি
iii) ক্রান্তীয় ঝোপজাতীয় বনভূমি
iv) পার্বত্য বনভূমি
v) উপকূলীয় বনভূমি

i) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং মিশ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি (Tropical Evergren & Semi Evergreen Forests)

পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্যাঞ্চল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে এই জাতীয় অরণ্য দেখা যায়। যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 200 সেমি এবং বার্ষিক গড় উত্তাপ 22° সেন্টিগ্রেড থাকে সেখানে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এইরূপ বনভূমিতে উদ্ভিদের ঘনত্ব খুব বেশি থাকে। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার ফলে গাছগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অধিক শাখাপ্রশাখাযুক্ত হওয়ায় বৃক্ষের তলদেশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। এজন্য নিম্নভাগে লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। এই বনভূমির বৃক্ষগুলো সাধারণত 60 মিটার বা তার বেশি লম্বা হয়। এই জাতীয় বৃক্ষে পাতা, ফুল এবং ফল ঝরে পড়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না। এজন্য বনভূমি সারাবছর সবুজ থাকে। এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলো হল রোজউড, মেহগনি, ইবনি, আবলুস, আয়রনউভ, তুন, পুন প্রভৃতি।

যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 200 সেমির কম থাকে সেখানে চিরহরিৎ ও আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। লতাগুল্ম বেষ্টিত জঙ্গল এই বনভুমির বৈশিষ্ট্য। প্রধান প্রধান বৃক্ষগুলো হল শ্বেত সিডার, জারুল, ছাতিম, খয়ের, মহুয়া প্রভৃতি।

চিত্র 5.1 চিরহরিৎ বনভূমি

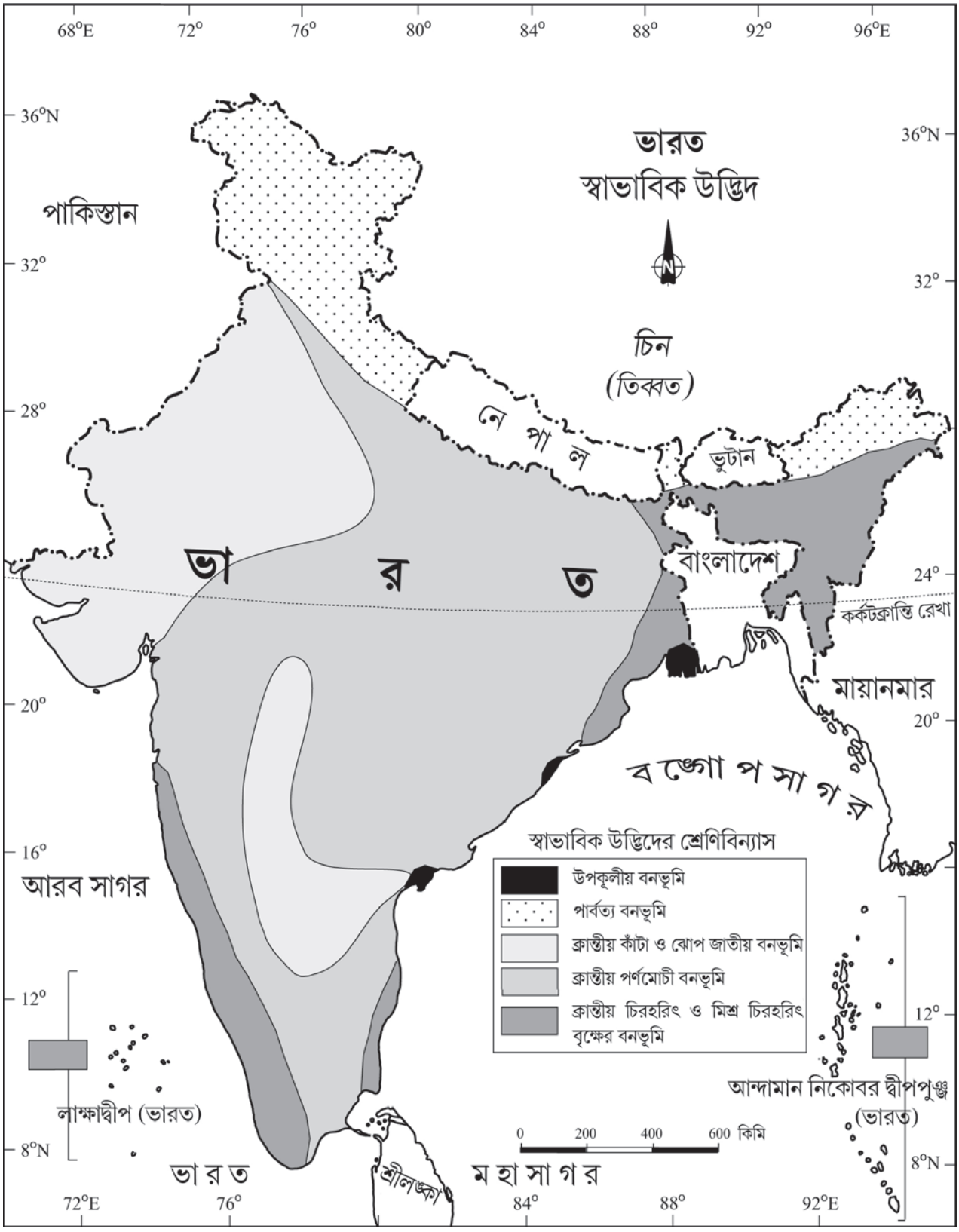

Figure 5.2 : Natural Vegetation

ব্রিটিশরা এই বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বুঝতে পেরে এই বনভূমির বৃক্ষ তাদের কাজে লাগাতে শুরু করেছিল। বনভূমির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে ওক বনভুমির পরিবর্তে পাইন বনভূমি দেখা যায়। এগুলো রেলের পাটাতন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চা, রাবার ও কফি চাষের জন্যও বনভূমি পরিষ্কার করা হয়েছিল। এই বনভূমির কাঠ তাপের কুপরিবাহী বলে ব্রিটিশরা নির্মাণ কাজেও এই বনভূমির কাঠ ব্যবহার করত। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যে বনসংরক্ষণ প্রয়োজন।

ii) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি (Tropical Deciduous Forests)

ভারতের অধিকাংশ বনভূমি পর্ণমোচী প্রকৃতির। এগুলো **মৌসুমি বনভুমি** নামেও পরিচিত। যে সকল অঞ্চলে 70-200 সেমির মতো বৃষ্টিপাত হয় সে সকল স্থানে এই জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। জলের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এই বনভূমিকে আর্দ্র পর্ণমোচী ও শুষ্ক পর্ণমোচী বনভূমি এই দুভাগেও ভাগ করা যায়।

চিত্র 5.3: পর্ণমোচী বনভূমি

সাধারণত 100 - 200 সেমি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে আর্দ্র পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায়। এই জাতীয় বনভূমি হিমালয়ের পাদদেশ, উত্তর- পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ, পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢাল এবং ওড়িশা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। শাল, সেগুন, শিশু, মহুয়া, গর্জন, আমলকী, চন্দন শিমূল, পলাশ, শিরীষ প্রভৃতি এই বনভূমির মূল্যবান বৃক্ষ।

দেশের বিশাল অংশ জুড়ে যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 70 - 100 সেমি সেখানে শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। আর্দ্রতাযুক্ত অঞ্চলে আর্দ্র পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায়, অপরদিকে শুষ্ক অঞ্চলে ঝোপজাতীয় বনভূমি গড়ে ওঠে। এই জাতীয় বনভূমি উপদ্বীপের বৃষ্টি বহুল অঞ্চল এবং উত্তর প্রদেশে ও বিহারের সমভূমিতে দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল এবং উত্তর ভারতের সমভূমিতে সেগুন ও অন্যান্য বৃক্ষের সমাবেশ দেখা যায়। অরণ্যের মাঝে প্রচুর তৃণ দেখা যায়, এদের **'সাভানা'** বলে। শুষ্ক ঋতুতে বৃক্ষগুলো থেকে পাতা ঝরা শুরু হয় এবং এক সময় একেবারে পাতাহীন হয়ে পড়ে। তৃণভূমি তখন উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, পাতাহীন বৃক্ষগুলো তৃণভূমির চারিদিকে থাকে। তেন্দু, পলাশ, বেল, খয়ের, কুল, শিরীষ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি এই বনভূমির মূল্যবান উদ্ভিদ। বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা এবং মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণের ফলে রাজস্থানের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে স্বাভাবিক উদ্ভিদ খুবই কম দেখা যায়।

iii) ক্রান্তীয় ঝোপজাতীয় বনভূমি (Tropical Thorn Forests)

যে সকল অঞ্চলে 50 সেমির কম বৃষ্টিপাত হয় সেসকল অঞ্চলে ঝোপজাতীয় বনভূমি দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস ও লতাপাতা এই বনভূমির পর্যায়ভুক্ত। পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের শুষ্কপ্রায় অঞ্চলে এই জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। বছরের অধিকাংশ সময় এই বনভূমি পত্রহীন থাকে। গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে তোমার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করো। বাবলা, বেরি, খেজুর, ফণিমনসা, নিম, খয়ের, পলাশ প্রভৃতি এই বনভূমির মূল্যবান বৃক্ষ। **তাসুকি ঘাস** (Tussocky grass) সাধারণত 2 মিটারের মতো উচুঁ হয়।

চিত্র 5.4 : ক্রান্তীয় ঝোপজাতীয় বনভূমি

iv)পাবর্ত্য বনভূমি (Montane Forests)

পাবর্ত্যাঞ্চলে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। পাবর্ত্য বনভূমিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উত্তরাংশের পার্বত্য বনভূমি এবং দক্ষিণাংশের পার্বত্য বনভূমি।

হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় ক্রান্তীয় থেকে তুন্দ্রা - সকল প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। সাধারণত 1000 - 2000 মিটার উচ্চতায় আর্দ্র ক্রান্তীয় বনভূমি দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরাঞ্চলের পার্বত্যঅংশে বৃহৎপত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষ, যেমন ওক, কাঠবাদাম বৃক্ষের প্রাধান্য দেখা যায়। এই অঞ্চলের 1,500 - 1,750 মিটার উচ্চতায় পাইন, চিরপাইন বনভূমি বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। হিমালয়ের পশ্চিমাংশে উৎপন্ন দেবদারু বৃক্ষের স্থানীয় গুরুত্ব অনেক বেশি। দেবদারু বৃক্ষের কাঠ বিশেষত নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়। এই অঞ্চলের চিনার, আখরোট বৃক্ষ কাশ্মীরি হস্তশিল্পে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 2,225 - 3,048 মিটার উচ্চতায় নীলপাইন ও স্প্রুস বৃক্ষ দেখা যায়। এই অঞ্চলে ক্রান্তীয় তৃণভূমিও দেখা যায়। কিন্তু আরও উচ্চতায় আল্পীয় বনভূমি ও চারণভূমিও দেখা যায়। 3,000 - 4,000 মিটার উচ্চতায় রুপালি ফার, জুনিপার, পাইন, বার্চ, রোডোডেনড্রন প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। এই চারণভূমিতে গুজ্জর, বাকারওয়াল, ভুটিয়া, গড্ডি প্রভৃতি যাযাবর উপজাতিরা পশুচারণ করে। হিমালয়ের উত্তর ঢাল অপেক্ষা দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদের ঘন সন্নিবেশ দেখা যায়। অধিক উচ্চতায় জলজ ও শৈবাল জাতীয় তুন্দ্রা বনভূমি দেখা যায়।

চিত্র 5.5 : পার্বত্য বনভূমি

উপদ্বীপীয় ভারতের তিনটি প্রধান অঞ্চল যথা, পশ্চিমঘাট পর্বত, বিন্ধ্য পর্বত ও নীলগিরি পার্বত্যাঞ্চলে দক্ষিণের পাবর্ত্য বনভূমি দেখা যায়। এই বনভূমি ক্রান্তীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,500 মিটার উচ্চতায় পশ্চিমঘাট পর্বতের নিম্নাংশে উপক্রান্তীয় অঞ্চল বিশেষত কেরালা, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে দেখা যায়। নীলগিরি, আনাইমালাই এবং পালানি পার্বত্যাঞ্চলে এই ক্রান্তীয় বনভূমি '**শোলা**' নামে পরিচিত। এছাড়া এই বনভূমির অর্থকরী বৃক্ষ হল সিঙ্কোনা, ম্যাগনোলিয়া, গুল্ম ও কঞ্চি জাতীয় (wattle) উদ্ভিদ। সাতপুরা এবং মহাকাল পর্বতেও এই জাতীয় বনভূমি দেখা যায়।

v) উপকূলীয় বনভূমি
(Littoral and Swamp Forests)

ভারত জলাভূমি ও জলজ আবাসস্থলে সমৃদ্ধ। এই ভূমির প্রায় 70 শতাংশ ভূমি ধানচাষের অর্ন্তভুক্ত। ভারতে জলাভূমির পরিমাণ 3.9 মিলিয়ন হেক্টর। ওড়িশার **চিল্কা হ্রদ** এবং ভরতপুরের **কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান** (Keoladeo National park) - এই দুটি জলাভূমিকে আন্তর্জাতিক পাখি - আবাসস্থলের তত্ত্বাবধানে (রামসার সম্মেলন) **পাখি-আবাসস্থল** হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে এই জলাভূমির গুরুত্ব অনেক বেশি।

> *জাতিসংঘের কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে আর্ন্তজাতিক সম্মেলন চুক্তি সাক্ষরিত হয়।*

ভারতের জলাভূমির বৈচিত্র্য অনুযায়ী আটটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

i) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণে 'লেগুন' এবং পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ দিকের জলাভূমি
ii) রাজস্থান, গুজরাট এবং কচ্ছ উপসাগরের বিস্তৃত লবণাক্ত ভূমি।
iii) গুজরাত থেকে পূর্বদিকে রাজস্থান (**কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান**) এবং মধ্যপ্রদেশের সুপেয় জলের হ্রদ ও জলাভূমি
iv) ভারতের পূর্ব উপকূলের (চিল্কা হ্রদ) ব-দ্বীপ জলাভূমি এবং উপহ্রদ (Lagoons)
v) গাঙ্গেয় সমভূমির সুপেয় জলাভূমি
vi) ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যাপ্রবণ অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড় এবং হিমালয়ের পাদদেশের জলাভূমি।
vii) কাশ্মীরের পার্বত্যাঞ্চল ও লাডাকের নদী ও হ্রদ সমূহ, এবং
viii) ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জলাভূমিউপকূলের লবণাক্ত জলাভূমি, জোয়ারের খাঁড়ি, কর্দমাক্ত ভূমি ও নদীমোহনায় ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। লবণতা সহ্যকারী এরূপ অনেক উদ্ভিদ এখানে জন্মায়। খাঁড়ি অঞ্চলের স্থিরজলে ও জোয়ারের প্রবাহপথে আড়াআড়িভাবে ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। এই বনভূমি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আবাসস্থল।

চিত্র 5.6 : ম্যানগ্রোভ বনভূমি

ভারতের 6,740 বর্গ কিমি অঞ্চল ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমির অন্তর্গত যা পৃথিবীর মোট ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমির 7 শতাংশ । আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে এই বনভূমি পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলো হল মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল। কিন্তু এই বনভূমিও অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে, তাই এই বনভূমি সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতে বনাঞ্চলের পরিমাণ (Forest Cover in India)

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতের মোট ভূমিভাগের 23.28 শতাংশ ভূমি অরণ্যাবৃত। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, বনাঞ্চল এবং প্রকৃত বনাবৃত ভূমি এক কথা নয়। বনাঞ্চল বলতে সকল ধরনের বৃক্ষের উপস্থিতিকে বোঝায়। অপরদিকে প্রকৃত বনাবৃত ভূমি বলতে দীর্ঘ ও বৃহৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমিকে বোঝায়। প্রথমটি রাজ্য রাজস্ব দপ্তর (State Revenue Department) কর্তৃক বিমানচিত্র এবং উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে তথ্যচিত্র সংগৃহীত হয়। ভারতের রাজ্য বনবিভাগ 2011 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রকৃত বনভূমির পরিমাণ 21.05 শতাংশ। বনাবৃতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঘন বনভূমির পরিমাণ 12.29 শতাংশ এবং উন্মুক্ত বনভূমির পরিমাণ 8.75 শতাংশ।

বনাঞ্চল ও বনাবৃত অঞ্চল রাজ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। লাক্ষাদ্বীপে বনভূমির পরিমাণ শূন্য শতাংশ, অপরদিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 86.93 শতাংশ। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের অধিকাংশ রাজ্যে বনভূমির পরিমাণ 10 শতাংশেরও কম। এই রাজ্যগুলো হল রাজস্থান, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লি। কৃষিকাজের জন্য পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার অধিকাংশ বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ 10 - 20 শতাংশ। তামিলনাড়ুসহ উপদ্বীপীয় ভারত, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং গোয়ায় 20 - 30 শতাংশ ভূমি অরণ্যাবৃত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহে 30 শতাংশ এর বেশি অঞ্চল অরণ্যাবৃত। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বনভূমির বৃদ্ধিতে সহায়ক।

প্রকৃত বনাঞ্চলেও বৈচিত্র দেখা যায়, যেমন জম্মু ও কাশ্মীরে বনাঞ্চলের পরিমাণ 9.56 শতাংশ। অপরদিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই বনাঞ্চলের পরিমাণ 84.01 শতাংশ। নিম্নে সারণিতে (পরিশিষ্ট -iv) ভারতের বনভূমি বণ্টন দেখানো হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দেশের 15 টি রাজ্যে মোট বনাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় থাকে।

প্রকৃত বনাঞ্চলের ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

অঞ্চল	বনাবৃত ভূমির শতকার পরিমাপ
i) অতি উচ্চ ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল	> 40
ii) মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল	20-40
iii) নিম্ন ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল	10-20
iv) অতি নিম্ন ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল	< 10

পরিশিষ্ট - iv থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এই চারটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের বনাঞ্চলের তালিকা প্রস্তুত করো।

বনভূমি সংরক্ষণ (Forest Conservation)

জনজীবন এবং পরিবেশের সাথে বনভূমির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে বনভূমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান সরবরাহ এবং সমৃদ্ধির জন্য বনভূমি সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই অনুসারে ভারত সরকার 'জাতীয় বনসংরক্ষণ নীতি'-র প্রস্তাব দেয় এবং 1952 সালে ভারতে এই নীতি গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে 1988 সালে পুনরায় সংশোধন করা হয়। নতুন বনসংরক্ষণ নীতি অনুসারে ভারত সরকার একদিকে বন সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থায়ী বনভূমি গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ওপরও নজর দেওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বনসংরক্ষণ নীতির লক্ষ্যগুলো হল -

i) দেশের 33 শতাংশ অঞ্চল বনভূমির অর্ন্তভুক্ত করা।

ii) পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে বনভূমির পূর্নস্থাপন করা।

iii) দেশের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র ও তার পরম্পরা বজায় রাখতে বনভূমি সংরক্ষণ করা।

iv) মৃত্তিকা ক্ষয় ও মরুভূমির প্রসার রোধ করা এবং বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণে বনভূমি সংরক্ষণ করা।

v) সামাজিক বনায়ন এবং পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

vi) আসবাবপত্র, জ্বালানি কাঠ, গবাদি পশুখাদ্য ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের ওপর গ্রামাঞ্চলের জনগণ বনভূমির ওপর নির্ভরশীল। তাই বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে জ্বালানি কাঠের বিকল্প ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

vii) দেশের সকল স্তরের জনগণ বিশেষত মহিলাদের বৃক্ষরোপণ, বনোৎপাটন বন্ধ করা এবং বনভূমির চাপ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি। বনভূমি সংরক্ষণ নীতি অনুসারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে :

বন ও জীবনধারণ (Forests and Life)

উপজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই তাদের আবাসস্থল, জীবনধারণ প্রণালী প্রভৃতির জন্য বনভূমির ওপর নির্ভরশীল। বনভূমি তাদেরকে খাদ্য, বিভিন্ন ধরনের ফল, খাদ্যোপযোগী পাতা, পুষ্টিকর মূল এবং বন্যপ্রাণী শিকারের সুযোগ করে দেয়। বনভূমি তাদের গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং শিল্পকলা চর্চার বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর পুষ্টিকর খাদ্য ও জীবনধারণ প্রণালীর জন্য উপজাতি অর্থনীতিতে বনভূমির গুরুত্ব খুবই বেশি। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং এরা বনভূমি রক্ষা করে। মোট 593 টি জেলার মধ্যে 188 টি জেলাকে উপজাতি অধ্যুষিত জেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উপজাতি অধ্যুষিত জেলার পরিমাণ দেশের মোট বনাবৃত অঞ্চলের প্রায় 59.61 শতাংশ যদিও দেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র 33.63 শতাংশ অঞ্চলে 188 টি উপজাতি অধ্যুষিত জেলা দেখা যায়। উপজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলো সাধারণত অধিক বনাবৃত অঞ্চলকে প্রদর্শন করে।

বনভূমি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। বনায়ন সম্পর্কে প্রাচীন উপজাতিদের ধারণাকে বনভূমির উন্নতিতে ব্যবহার করা হয়। গৌণ বনজ সম্পদ সংগ্রহকারী এই উপজাতি জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

সামাজিক বনায়ন (Soil Forestry)

সামাজিক বনায়ন বলতে সুষ্ঠু পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং পতিত ও অনাবাদি ভূমিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ, সমাজ এবং গ্রামীণ উন্নতিসাধনকে বোঝায়।

জাতীয় কৃষি কমিশন (National Commission of Agriculture - 1976) সামাজিক বনায়নকে তিনটি ভাগ করেছে। এগুলো হল শহুরে বনায়ন, গ্রামীণ বনায়ন এবং খামার বনায়ন।

শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত বা সর্বজনীনভাবে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সবুজায়ন গড়ে তোলাকে শহুরে বনায়ন বলে। বাড়িঘর, রাজপথের উভয়পাশে পার্ক, শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র সমূহে বৃক্ষরোপণ এর পর্যায়ভুক্ত।

গ্রামীণ বনায়ন সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

একই জমিতে কৃষিজ ফসলের সাথে বৃক্ষরোপণ করা কৃষি **বনায়ন** নামে পরিচিত। বনভূমির সাথে কৃষিজ দ্রব্যে সমন্বয় যেমন, খাদ্যশস্য উৎপাদন, গবাদি পশুখাদ্য উৎপাদন, আসবাবপত্রের কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ফল প্রভৃতি একই সাথে উৎপাদিত হয়। সর্বজনীন বা সরকারি মালিকানাধীন স্থান, যেমন গ্রামীণ চারণভূমি, মন্দির সংলগ্ন স্থান, রাস্তা, খাল ও রেলপথের ধারে এবং স্কুলসংলগ্ন স্থান প্রভৃতি সামাজিক বনায়নের অন্তর্ভুক্ত। সমাজের সার্বিক উন্নতিসাধনই সামাজিক বনায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ভূমিহীন মানুষদের বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হয়। ফলে তারা সেই সুবিধাগুলো পায় যেগুলো থেকে ভূমিমালিকরা তাদেরকে বঞ্চিত করে।

খামার বনায়ন (Farm forestry)

বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অবাণিজ্যিকভাবে কৃষকরা খামার বাড়িতে যখন বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করে তা **খামার বনায়ন** নামে পরিচিত।

বিভিন্ন রাজ্যে বনদপ্তর থেকে বিনামূল্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়ের কৃষকদের চারা সরবরাহ করা হয়। কিছু কিছু ভূমি যেমন কৃষিজমি সংলগ্ন ভূমি, তৃণ ও চারণভূমি, বাড়ির চারপাশ ও গোশালার সন্নিহিত স্থানে বৃক্ষরোপণ করা প্রভৃতি অবানিজ্যিক খামার বনায়ন- এর অন্তর্ভুক্ত।

বন্যপ্রাণী (Wild life)

তোমরা নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানায় খাঁচার ভেতর অনেক পশু ও পাখি দেখেছ। ভারতের বন্যপ্রাণী অত্যন্ত প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। অনুমান করা

হয় যে, পৃথিবীর সমস্ত পরিচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অনুমানিক 4 -5 শতাংশ ভারতে পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণী এই অসাধারণ বৈচিত্র্যের যা যুগযুগ ধরে ভারতে সংরক্ষিত ও অনুমোদিত। বহু বছর ধরে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এরফলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য-ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আবার কিছু কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত-প্রায়।

বন্যপ্রাণী হ্রাসের কয়েকটি প্রধান কারন হল

i) শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে দ্রুতহারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে।

ii) কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি, মানুষ্যবসতি স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খনিখনন, জলাধার নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে বন ধ্বংস করা হচ্ছে।

iii) স্থানীয় জনগণ জ্বালানি কাঠ ও পশুচারণের জন্য উচ্চভূমিতে অবস্থিত বনভূমি ধ্বংস করে।

iv) গৃহপালিত পশুচারণের ফলে বন্যপ্রাণী ও বাসস্থানের ওপর প্রভাব পড়ে।

v) প্রাচীনকালে শিকারকে অভিজাত বর্গের একটি বিশেষ খেলা হিসেবে গ্রহণ করা হত। এর ফলে এক একটি শিকারে শত শত বন্যপ্রানী হত্যা করা হত, এখনও বানিজ্যিক চোরা শিকারীদের দ্বারা ব্যাপক হারে পশু শিকার করা হয়।

vi) দাবানলের ফলে বন ধ্বংস হয়।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ জাতীয় তথা বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এর মাধ্যমে বন্যপ্রাণী পালন ও প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গতি সাধন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো কী কী?

ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
(Wildlife Conservation in India)

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য। সুদূর অতীতের বিভিন্ন গল্প ও আখ্যান যেমন, 'পঞ্চতন্ত্র', 'জঙ্গালবুক' প্রভৃতি থেকে বন ও বন্যপ্রাণীর প্রতি ভারতবাসীর অনুরাগ সম্পর্কে জানা যায় যার ফলে খুব ছোটো বয়সে মনে গভীরভাবে এই ধারণা প্রেক্ষিত হয়।

1972 সালে বন্যপ্রাণী পরিবর্ধন ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই আইনের মুখ্য দুটো উদ্দেশ্য হল এই আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ করা এবং সংরক্ষিত অঞ্চলে জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও বন্ধ অঞ্চলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রভৃতি। 1991 সালে এই আইনে ব্যাপক সংশোধন করা হয়। এখানে নির্দিষ্ট ও বিলুপ্তপ্রায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং শাস্তিদানের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

ভারতে 15.67 মিলিয়ন হেক্টর অঞ্চল জুড়ে 102 টি জাতীয় উদ্যাণ এবং 515 টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র ও অভয়ারণ্য রয়েছে।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তবে মানুষের কার্যকলাপের সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিশাল ব্যবধান রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষ যখন বন ও বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব বুঝবে এবং স্বউদ্যোগে বন সংরক্ষণ করবে তখন আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে UNESCOর 'মানুষ ও জীবমণ্ড ল কর্মসূচি (Man and Biosphere programme)'-র সাথে দেশকে যুক্ত করেছে।

বিশেষ প্রজাতির প্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য ব্যাঘ্র প্রকল্প (1973), হাতি প্রকল্প (1992) প্রভৃতি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

1973 সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, ভারতের বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত মান সুনিশ্চিত করা এবং জনগণের শিক্ষা ও আনন্দ দান জাতীয় ঐতিহ্য ও জৈববৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য এ সকল অঞ্চল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে 16,339 বর্গকিমিতে ন'টি (9) ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে **ব্যাঘ্র প্রকল্প** চালু হলেও বর্তমানে 17 টি রাজ্যের 36,988.28 বর্গ কিমিতে 44 টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র ও আবাসস্থল রয়েছে। 2006 সালে ভারতে বাঘের সংখ্যা 1411 টি ছিল, 2010 সালে তা বেড়ে 1706 টি হয়েছে।

বুনো হাতির অবাধ বিচরণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 1992 সালে **হাতি প্রকল্প** চালু হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে হাতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। 17 টি রাজ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এর অঙ্গ হিসেবে আরও কিছু প্রকল্প, যেমন কুমীর প্রজনন প্রকল্প, হাঙ্গুল বা মৃগ (Hangul) প্রকল্প এবং হিমালয়ের কস্তুরী মৃগ সংরক্ষণ প্রকল্প প্রভৃতি ভারত সরকার দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চিত্র 5.7 : প্রাকৃতিক পরিবেশে হাতি

জীবমণ্ডল সংরক্ষণ (Biosphere Reserves)

UNESCO-র 'মানুষ ও জীবমণ্ডল (MAB)টি কর্মসূচি' অনুসারে স্থলজ ও উপকূলীয় অঞ্চলে এক অদ্বিতীয় বাস্তুতন্ত্র দেখা যায় এবং তার আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিও রয়েছে। এই জীবমণ্ডল সংরক্ষণের তিনটি উদ্দেশ্য চিত্র নং 5.8 এ বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতে 18 টি জীবমণ্ডল সংরক্ষণকেন্দ্র (সারণি 5.1 এবং চিত্র 5.9) রয়েছে। এর মধ্যে UNESCO কর্তৃক স্বীকৃত 10 টি সংরক্ষণ কেন্দ্র পৃথিবীর অন্যান্য জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত।

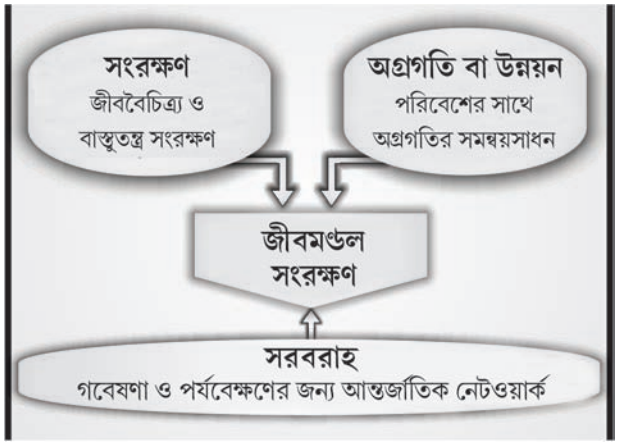

চিত্র 5.8 : জীবমণ্ডল সংরক্ষণের বিভিন্ন উপাদান

সারণি 5.1 : জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা

ক্রম	জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্র ও তা	বাস্তবায়নেব	রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের অবস্থান
1	**নীলগিরি (5520)**	01.08.1986	ওয়ানাদের অংশবিশেষ, নাগেরহোল, বান্দিপুর ও মধুমালাই নিলামপুর, সাইলেন্ট (Silent) ভ্যালি ও সিরুভানি পাহাড় (তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটক)
2	**নন্দাদেবী (5860.69)**	18.01.1988	চামোলির অংশবিশেষ, উত্তরাঞ্চলের পিথোরগড় ও আলমোড়া জেলা।
3	**নকরেক (820)**	01.09.1988	মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ।
4	**মানস (2837)**	14.03.1989	কোকরাঝাড়ের কিয়দংশ, আসামের বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা, নালবাড়ি, কামরূপ ও দারং জেলা।
5	**সুন্দরবন (9630)**	29.03.1989	পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপের অংশবিশেষ।
6	**মান্নার উপসাগর (10,500)**	18.02.1989	ভারতের অন্তর্গত মান্নার উপসাগরের রামেশ্বরমের উত্তর থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত।
7	**বৃহৎ নিকোবর (885)**	06.01.1989	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ।
8	**সিমলিপাল (4374)**	21.06.1994	ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা।
9	ডিব্রু-সৈখাওয়া (765)	28.07.1997	আসামের ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া জেলা।
10	দিহাং - দিবাং (5111.5)	02.09.1998	অরুণাচল প্রদেশের উচ্চ ও পশ্চিম সিয়াং এবং দিবাং উপত্যকা।
11	**পাচমারি (4981.72)**	03.03.1999	মধ্যপ্রদেশের বেতুল, হোসাঙ্গাবাদ এবং ছিন্দওয়ারা জেলা।
12	কাঞ্চনজঙ্ঘা (2619.92)	07.02.2000	সিকিমের উত্তর ও পশ্চিম জেলা,
13	অগস্ত্যমালাই (3500.36)	12.11.2001	তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি ও কন্যকুমারী জেলা এবং কেরালার তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম এবং পাঠানমথিট্ট জেলা।
14	**আচানকমার অমরকন্টক (3835.51)**	**30.03.2005**	**মধ্যপ্রদেশের অনুপুর ও দিনদোরি জেলা।**
15	কচ্ছ (12.454)	29.01.2008	গুজরাটের কচ্ছ, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর এবং পাটান জেলা।
16	শীতল মরুভূমি (7770)	28.08.2009	পিন ভ্যালি জাতীয় উদ্যান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল, হিমাচল প্রদেশের চন্দ্রতাল, সরচু ও কিবের অভয়ারণ্য।
17	শেশাচালাম (4755.997)	20.09.2010	পূর্বঘাট পর্বতমালার শেশ চালাম পাহাড়ঘেরা চিতোরের অংশবিশেষ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপা জেলা।
	পান্না (2998.98)	25.08.2011	মধ্যপ্রদেশের পান ও ছত্রপুর জেলা।

* চিহ্নিত সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিক প্রকল্প UNESCO-র (BR) জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
উৎস : বার্ষিক রিপোর্ট 2013-14 ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনদপ্তর

চিত্র 5.9 : ভারত: জীবমন্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্র

নীলগিরি জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্র (Nilgiri Biosphere Reserve)

নীলগিরি জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্রটি (NBR), ভারতের 14টি সংরক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম। এটি 1986 সালের সেপ্টেম্বরে গড়ে তোলা হয়। ওয়ানাদ, নাগেরহোল, বান্দিপুর ও মুদুমালাই, নিলামবুরের পর্বতঢালের সমগ্র বনাঞ্চল, নীলগিরি মালভূমির উচ্চাংশ, সাইলেন্ট ভ্যালি (Silent Vallay) এবং সিরুভানি পাহাড় এই অভয়ারণ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্রের মোট আয়তন 5,520 বর্গকিমি।

নীলগিরি জীবমন্ডল সংরক্ষণকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায়। দূষণমুক্ত এই অঞ্চলে কিছু ঝোপজাতীয় উদ্ভিদ, শুষ্ক ও আর্দ্র পর্ণমোচী বনভূমি, শুষ্ক ও আর্দ্র চিরহরিৎ বনভূমি, তৃণভূমি, জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি নানা প্রজাতির উদ্ভিদের সমাবেশ দেখা যায়। দুটো বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী, যেমন নীলগিরি তেহর (Nilgiri Tahr) ও সিংহ পুচ্ছ ম্যাকক (Lion tailed macaque) দেখা যায়। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রে দক্ষিণ ভারতের সর্বাধিক হাতি, বাঘ, গৌড়, সাম্বার, চিতল প্রভৃতি বন্য প্রাণী রয়েছে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এই সংরক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে। এখানে উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস এবং তাদের ঐতিহ্য ও পরিবেশের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যবহারও দেখা যায়।

নীলগিরি সংরক্ষণ কেন্দ্রের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। ভূমির উচ্চতা 250 - 2650 মিটার। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রের প্রায় 80 শতাংশ ফুলপ্রদায়ী উদ্ভিদ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অর্ন্তগত।

নন্দাদেবী জীবমণ্ডল সংরক্ষণ (Nandadevi Biosphere Reserve)

নন্দাদেবী জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্রটি উত্তরাঞ্চলের চামোলি, আলমোড়া, পিথোরগড় এবং বাগেশ্বর জেলা নিয়ে গঠিত।

এই সংরক্ষণ কেন্দ্রের বেশিরভাগ বনভূমি নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি যেমন - সিলভারউড এবং অর্কিড ছাড়াও লতিফোলি ও রোডোডেনড্রন দেখা যায়। নন্দাদেবী সংরক্ষণ -কেন্দ্রটি প্রাণী দ্বারা সমৃদ্ধ যেমন - কালো ভালুক, বাদামি ভালুক, সোনালি ঈগল ও কালো ঈগল প্রভৃতি। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হল বিপুল পরিমাণে ঔষধিগাছ সংগ্রহ, দাবানল এবং চোরা শিকার।

সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্র (Sundarban Biosphere Reserve)

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা ব- দ্বীপের জলাভূমিতে এই সংরক্ষণ কেন্দ্রটি অবস্থিত। বিশাল অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। আয়তন 9630 বর্গকিমি এবং ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ, জলজ উদ্ভিদ ও বনভূমি দ্বারা এই দ্বীপটি গঠিত। প্রায় 200 টি রয়াল বেঙ্গাল টাইগারের আবাসস্থল হল সুন্দরবন।

ম্যানগ্রোভ গাছের জালিকাময় শিকড়গুলো বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, যেমন চিংড়ি থেকে বড়ো মাছের নিরাপদ আবাসস্থল। এই ম্যানগ্রোভ বনভূমি 170 টিরও বেশি প্রজাতির পাখির আবাসস্থল।

লবণাক্ত ও স্বাদু জল - উভয় পরিবেশের সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল মানিয়ে চলে। এই পার্কের বাঘ খুব ভালো সাঁতারু। এরা বিরল প্রজাতির চিতল হরিণ, কাকর হরিণ (Barking Soor) বুনো শূকর, ম্যাকক প্রভৃতি শিকার করে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ হল সুন্দরী গাছ। এই গাছের কাঠ খুবই মূল্যবান।

মান্নার উপসাগর জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্র (Gulf of Mannar Biosphere Reserve)

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে 105,000 হেক্টর জুড়ে মান্নার উপসাগর জীবমণ্ডল অবস্থিত। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংরক্ষণকেন্দ্র পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। মোহনা, সৈকতভূমি, সমুদ্র তীরবর্তী বনভূমি, সমুদ্র ঘাস, প্রবলকীট, লবণাক্ত উদ্ভিদ ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রভৃতি সহ 21টি দ্বীপ রয়েছে। উপসাগরে 3,600 টি প্রজাতির উদ্ভিদ এবং বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী যেমন সমুদ্র তিমি (Sea cow / Dugong dugon) রয়েছে। ছ'টি বিপন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভের পাশাপাশি উপদ্বীপীয় ভারতের কিছু লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদও রয়েছে।

অনুশীলনী

1) **নিম্নের চারটি থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :**

ক) চন্দন কাঠ যে বনভূমিতে পাওয়া যায় -

অ) চিরহরিৎ বনভূমি আ) ব-দ্বীপ অঞ্চলের বনভূমি

ই) পর্ণমোচী বনভূমি ঈ) কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ

খ) নিম্নের কোন্‌টি বাঘ্র প্রকল্পের উদ্দেশ্য -

অ) বাঘ হত্যা করা আ) অবৈধ শিকারিদের হাত থেকে বাঘদের রক্ষা করা

ই) বাঘদের চিড়িয়াখানায় রাখা ঈ) বাঘদের ওপর চলচ্চিত্র তৈরি করা

গ। নিম্নের কোন্ রাজ্যে নন্দাদেবী জীবমণ্ডল সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে -

অ) বিহার আ) উত্তরাঞ্চল

ই) উত্তর প্রদেশ ঈ) ওড়িশা

ঘ। UNESCO কর্তৃক ভারতের কটি জীবমণ্ডল স্বীকৃতি পেয়েছে -

অ) একটি আ) দশটি

ই) দুটো ঈ) চারটি

ঙ। 'ভারতের বন নীতি' অনুসারে দেশের কত শতাংশ ভূমি বনভূমির আওতায় নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে?

অ) 33 আ) 55

ই) 44 ঈ) 22

2) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :**

ক) স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে কী বোঝ? ক্রান্তীয় চিরহরিৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কী ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন?

খ) সামাজিক বনায়ন বলতে কী বোঝ?

গ) জীবমণ্ডল সংরক্ষণের সংজ্ঞা দাও।

ঘ) বনাঞ্চল ও বনাবৃত (forest area and forest cover) অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য লেখো:

3) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর 150 টির কম শব্দে উত্তর দাও -**

ক) বনভূমি সংরক্ষণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

খ) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনগণ কী কী ভাবে সাহায্য করতে পারে?

প্রকল্প / কাজ

i. ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করো ও নাম লেখো:

অ) ম্যানগ্রোভ বনভূমি

আ) জীবমণ্ডল সংরক্ষণ - নন্দাদেবী, সুন্দরবন, মান্নার উপসাগর এবং নীলগিরি

ই) ভারতের বন জরিপের প্রধান কার্যালয়টির অবস্থান চিহ্নিত করো

ii. তোমরা বিদ্যালয়ের প্রধান চারপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড় ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ খুঁজে বের করো। তাদের স্থানীয় নাম ও ব্যবহার লেখো।

অধ্যায়

6

মৃত্তিকা
Soils

তোমরা কি কখনও পৃথিবীপৃষ্ঠে গাছপালা, ঘাস, শস্যসহ অসংখ্য জীবের প্রাণধারণের প্রধান উপাদানটি সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? মৃত্তিকা ছাড়া তোমরা কি একটি ঘাসও উৎপাদন করতে পারবে? যদিও কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী স্বাভাবিকভাবে জলে জন্মায়, তারা কি জলের মাধ্যমে মৃত্তিকা থেকে পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ করে না? এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা অতি মূল্যবান সম্পদ। ভূমি থেকে উৎপাদিত আমাদের খাদ্যের বৃহৎ অংশ এবং আমাদের অধিকাংশ পোশাক মৃত্তিকাজাত বিভিন্ন ফসল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপন্ন হয়। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আমরা মাটির ওপর নির্ভরশীল। আবহবিকার ও বিচূর্ণীভবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এই কোমল মৃত্তিকার স্তর গঠন করেছে।

পৃথিবীর উপরিভাগে শিলাচূর্ণ ও বিভিন্ন জৈবিক পদার্থসমূহ সংমিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে। মৃত্তিকা গঠনের প্রধান নিয়ন্ত্রকগুলো বা কারণগুলো হল ভূ-প্রকৃতি, জনক শিলা বা শিলাজাত উপাদান (Parent material), জলবায়ু, উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব এবং সময়। এগুলো ছাড়াও মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলিও মৃত্তিকা গঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্তিকার বিভিন্ন উপাদানগুলো হল খনিজ পদার্থ, হিউমাস, জল এবং বায়ু। এই সকল উপাদানের সঠিক পরিমাণের উপর মৃত্তিকার প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ভর করে। কিছু মৃত্তিকায় এক বা একাধিক উপাদনের অভাব দেখা যায়, আবার কিছু মৃত্তিকাতে নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

তোমাদের স্কুলের মাঠে বনমহোৎসব পালনের সময় কখনও গাছ লাগানোর জন্য মৃত্তিকা খনন করেছ কি? সেই গর্তে মৃত্তিকার স্তর কি সমভাবে রয়েছে বা তোমরা কি খননকৃত গর্তের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত মৃত্তিকার বিভিন্ন রং লক্ষ করেছ?

ভূমিতে গর্ত খনন করে সেই মৃত্তিকার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, এখানে তিনটি স্তর রয়েছে, এদের স্তর (Horizon) বলে। 'স্তর A' (Horizon A) হল মৃত্তিকার সর্বোচ্চ স্তর। এখানে জৈব পদার্থের সাথে খনিজ পদার্থ, পুষ্টিকর উপাদান ও জল মিশ্রিত রয়েছে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। 'স্তর B' (Horizon B) হল 'স্তর A' ও 'স্তর C'-এর মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তর উর্ধ্বস্তর 'A' এবং নিম্নস্তর 'C' উভয় থেকেই পদার্থ সংগ্রহ করে। এই স্তরে কিছু জৈব উপাদান রয়েছে যদিও আবহবিকার প্রাপ্ত খনিজ উপাদানও উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে। 'স্তর C' (Horizon C)' শিথিলজনক শিলা দ্বারা গঠিত। মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় হল এই 'C' স্তর। এই স্তরের উপরে রয়েছে 'A' এবং 'B' স্তর। এই স্তরগুলোর পরস্পর মিলিত রূপকে মৃত্তিকা পরিলেখ (Soil Profile) বলে। মৃত্তিকা গঠনের এই তিনটি স্তরের নীচে অবস্থিত শিলা, জনক শিলা বা প্রাথমিক শিলা নামেও পরিচিত। মৃত্তিকা হল একটি জটিল ও বৈচিত্র্যময় সত্তা যা সবসময় বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মৃত্তিকার গুরুত্ব বোঝার জন্য তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ হল একটি প্রয়াস বা প্রচেষ্টা। নীচে মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল।

মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Soil)

ভারতে ভূ-প্রকৃতি, ভূমিরূপ, জলবায়ু এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এগুলো ভারতের বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাচীনকালে মৃত্তিকাকে দুটো প্রধানভাগে ভাগ করা হত যা একটি হল উর্ভরা (Urvara) এবং অপরটি হল উষারা (Usara) যেগুলো হল যথাক্রমে উর্বর এবং অনুর্বর। ষোড়শ শতক থেকে মৃত্তিকার সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং বহির্জাত বৈশিষ্ট্য যেমন, মৃত্তিকার বুনন, রং, ভূমির ঢাল এবং মৃত্তিকার আর্দ্রতা অনুসারে মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ করা হয়। মৃত্তিকার বুনন অনুসারে বালুকাময়, কঙ্করময়, পলিময়, কাদাময় দোঁয়াশ মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। রং অনুসারে মৃত্তিকাকে লাল, হলুদ, কালো ইত্যাদি ভাগে ভাগে করা হয়।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সংস্থা মৃত্তিকা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে। 1956 সালে Soil Survey of India গঠিত হয় এবং দামোদর উপত্যকার কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক গবেষণা করে। India Council of Agricultural Research (ICAR) -এর অধীনে National Bureau of Soil Survey এবং The Land Use Planning an Institute ভারতের মৃত্তিকা সম্পর্কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেছে। United State Department of Agriculture (USDA) -এর মৃত্তিকার বর্গীকরণের ভিত্তিতে মৃত্তিকা সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁদের প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করে ICAR মৃত্তিকার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতের মৃত্তিকাকে শ্রেণিবিভাগ করেছে।

উৎপত্তি, রং, বুনন, প্রকৃতি ও অবস্থান অনুসারে ভারতের

USDA-র মৃত্তিকার বর্গীয়করণের ভিত্তিতে ICAR প্রদত্ত ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ নিম্নে দেখানো হল -

ক্রমিক নং	ক্রম	অঞ্চল (হাজার হেক্টর)	শতকরা
i)	ইনসেপ্টিসলস (Inceptisols)	130372.90	39.74
ii)	অ্যান্টিসলস (Entisols)	92131.71	28.08
iii)	আলফিসলস (Alfisols)	44448.68	13.55
iv)	ভারটিসলস (Vertisols)	27960.00	8.52
v)	এরিডিসলস (Aridisols)	14069.00	4.28
vi)	আলটিসলস (Ultisols)	8250.00	2.51
vii)	মোলিসলস (Mollisols)	1320.00	0.40
viii)	অন্যান্য (Other)	9503.10	2.92
		মোট	**100**

উৎস : Soils of India, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, Publication Number - 94

মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় -

i) পলি বা পাললিক মাটি
ii) কালো মাটি
iii) লাল ও হলুদ মাটি
iv) ল্যাটেরাইট মাটি
v) শুষ্ক অঞ্চলের মাটি
vi) লবণাক্ত মাটি
vii) উদ্ভিজ্জ পদার্থযুক্ত মাটি
viii) বনভূমি সৃষ্ট মাটি

পলিমাটি বা পাললিক মৃত্তিকা (Alluvial Soils)

উত্তরের বিস্তীর্ণ সমভূমি ও নদী উপত্যকায় পাললিক মাটি বেশি দেখা যায়। দেশের প্রায় 40 শতাংশ অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।

চিত্র 6.1: পাললিক মাটি

নদী ও অন্যান্য জলপ্রবাহ দ্বারা পরিবাহিত ও সঞ্চিত হয়ে এই পলিমাটি সৃষ্টি হয়। রাজস্থানে এই সমভূমি সংকীর্ণ হলেও গুজরাটে পলিগঠিত সমভূমি কিছুটা বিস্তৃত হয়েছে। উপদ্বীপীয় অঞ্চলে পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ ও নদী উপত্যকায় পলিমাটি দেখা যায়।

পলিমাটি বালুকাময় দোঁয়াশ মাটি থেকে কাদামাটিতে পরিবর্তিত হয়। এই মাটিতে পটাশিয়াম বেশি থাকলেও ফসফরাস কম থাকে। উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে দুটো ভিন্ন প্রকৃতির পলি মাটি দেখা যায়, যেমন - খাদর ও ভাঙ্গার। খাদর হল নবীন পলিমাটি, যা প্রতিবছর বন্যার ফলে নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত হয়। এই মাটি খুব উর্বর। অপরদিকে ভাঙ্গার হল প্রাচীন পলিমাটি। এই প্রাচীন পলিসঞ্চিত মাটি বন্যাপ্রবণ অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত। খাদর ও ভাঙ্গার - উভয় মাটিই চুনমিশ্রিত পাথুরে (কঙ্করময়) মাটি। নিম্ন ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মাটি আরও বালিময় দোঁয়াশ ও কাদাময় হয়। দেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বালির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে।

এই পলিমাটি ধূসর থেকে হালকা ধূসর রঙের হয়। পলিসঞ্চয়ের গভীরতা, মাটির বুনন ও মাটিতে পরিণত হবার সময় প্রভৃতির ওপর মাটির রং নির্ভর করে। এই পলিমাটি কৃষিকাজের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা কালোমাটি (Black Soil)

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অধিকাংশ স্থান বিশেষত মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর কিয়দংশে কালোমাটি দেখা যায়। গোদাবরী ও কৃষ্ণা অববাহিকার উচ্চ অংশ ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশে খুব গভীরতা পর্যন্ত

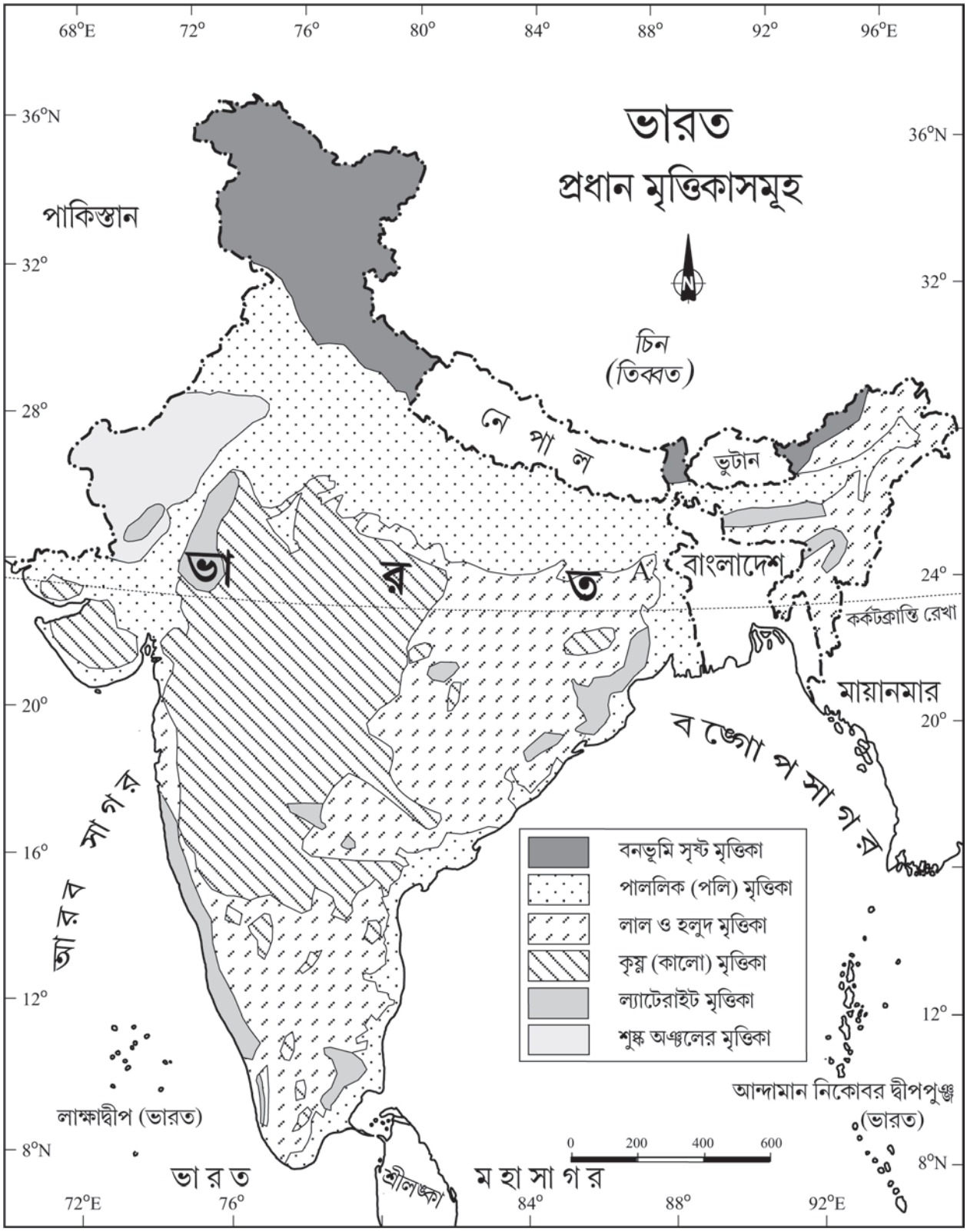

চিত্র 6.2 : ভারতের প্রধান মৃত্তিকাসমূহ

কালোমাটি দেখা যায়। এই মাটি 'রেগুর' বা 'কালো কার্পাস মাটি' নামেও পরিচিত। এই কালোমাটি সাধারণত কাদাময়, গাঢ় এবং অপ্রবেশ্য। আর্দ্র বা সিক্ত অবস্থায় এই মাটি স্ফীত ও আঠালো থাকে; অপরদিকে শুষ্ক অবস্থায় সংকুচিত হয়। তাই শুষ্ক ঋতুতে এই মৃত্তিকায় বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। এজন্য এই মাটিতে 'স্ব-চাষ বা Self ploughing' দেখা যায়। এই মাটির আর্দ্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ও শোষিত হয় বলে কালো মাটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে, যা শস্যচাষে সহায়ক। বিশেষত বৃষ্টির জলে উৎপাদিত ফসলসমূহ শুষ্ক ঋতুতে উৎপাদনে সহায়তা করে।

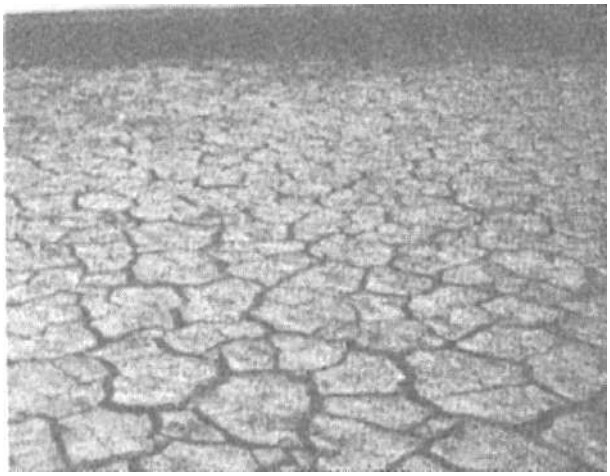

চিত্র 6.3 : শুষ্ক ঋতুতে কালো মাটি

চুন, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানে কালোমাটি সমৃদ্ধ। এই মাটিতে পটাশও রয়েছে। তবে ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও জৈব উপাদানের পরিমাণ নগণ্য। এই মাটির রং গাঢ় কালো থেকে ধূসর বর্ণের হয়।

লাল ও হলুদ মাটি বা মৃত্তিকা (Red and Yellow soil)

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পূর্ব ও দক্ষিণাংশের কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে স্ফটিকাকার আগ্নেয়শিলা থেকে লালমাটির সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাল দোঁয়াশ মাটি দেখা যায়। ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের কিয়দংশ, মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণাংশেও লাল ও হলুদ মাটি দেখা যায়। স্ফটিকময় ও রূপান্তরিত শিলায় লোহার ব্যাপক অবস্থানের ফলে এই মাটির রং লাল হয়েছে। এই মাটি যখন জলযোজিত হয় তখন হলুদ রঙ ধারণ করে। সূক্ষ্ম দানাযুক্ত লাল ও হলুদ মাটি সাধারণত উর্বর, তবে স্থূল দানাযুক্ত মাটি শুষ্ক উচ্চ অঞ্চলে দেখা যায় এবং অনুর্বর। এই মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও হিউমাস বা জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকে।

ল্যাটেরাইট মাটি বা মৃত্তিকা (Laterite Soil)

ল্যাটিন শব্দ 'ল্যাটার'(Later) থেকে ল্যাটেরাইট শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ইট (Brick)। অধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পরিশ্রুত হয়ে এই মাটি গঠিত হয়। বৃষ্টির সাথে চুন ও সিলিকা মাটিতে মিশে যায় এবং আয়রন অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম যৌগ অভ্যন্তরে চলে যায়। এই মৃত্তিকার হিউমাসের পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দ্রুত শোষিত হয় যা উচ্চ তাপমাত্রায় অধিক সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এই মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, জৈব পদার্থ, ক্যালশিয়াম কম থাকে, অপরদিকে আয়রন অক্সাইড ও পটাশ অধিক থাকে। এজন্য ল্যাটেরাইট মাটি কৃষির অনুপযুক্ত। যদিও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে চাষের উপযোগী করার জন্য রাসায়নিক সারের প্রয়োগ আবশ্যিক।

তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশের লাল ল্যাটেরাইট মাটি কাজুবাদাম চাষের জন্য উৎকৃষ্ট।

ল্যাটেরাইট মাটি দিয়ে ইট তৈরি করা হয়, যা গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। উপদ্বীপীয় মালভূমির উচ্চতর স্থানে মূলত এই মাটি দেখা যায়। সাধারণত কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার পাহাড়ি অঞ্চল ও আসামে ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়।

শুষ্ক মাটি বা মৃত্তিকা (Arid Soil)

শুষ্ক মাটি লাল থেকে বাদামি রঙের হয়। এই মাটি গঠনগত দিক থেকে বালিময় হলেও লবণাক্ত প্রকৃতির হয়। কিছু কিছু অঞ্চলে লবণাক্ত জল বাষ্পীভূত হয় বলে মাটিতে লবণের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। শুষ্ক জলবায়ু, উচ্চ তাপমাত্রা ও দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে এই মাটিতে আর্দ্রতা ও হিউমাসের অভাব দেখা যায়। ফসফেট সমপরিমাণে থাকলেও নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। নিম্নাভিমুখে ক্যালশিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে নিম্নস্তরে কাঁকরময় মাটির স্তর সৃষ্টি হয়। তলদেশ

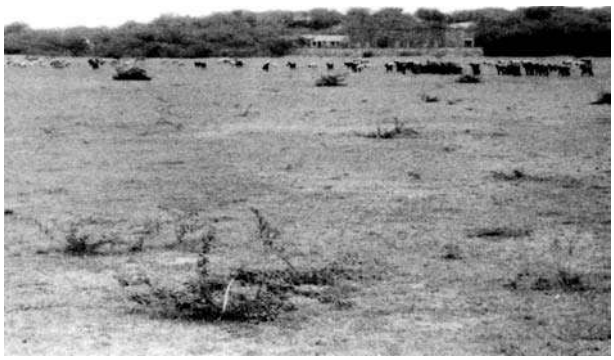

চিত্র 6.4 : শুষ্ক মাটি

কাঁকরময় হওয়ার ফলে মাটির অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করতে পারে না। তবে এখানে জলসেচের ব্যবস্থা করা হলে এই আর্দ্র মাটি উদ্ভিদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। রাজস্থানের পশ্চিমাংশে শুষ্ক মাটির গুণগত বিকাশ ঘটে যা শুষ্ক ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করে। এই মাটি অনুর্বর এবং এতে হিউমাস ও জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম থাকে।

লবণাক্ত মাটি বা মৃত্তিকা (Saline Soils)

এই মাটি উষারা (Usara) মাটি নামেও পরিচিত। এই মাটিতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম,ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। ফলে এই মাটি অর্নুবর এবং কৃষিকাজের অনুপযুক্ত। শুষ্ক জলবায়ু ও জলনিকাশি ব্যবস্থার অভাবে এই মাটি অধিক লবণাক্ত। সাধারণত শুষ্ক, আংশিক শুষ্ক অঞ্চল, জলমগ্ন ও জলাভূমিতে এই মাটি দেখা যায়। এই মাটি বালুকাময় থেকে দোঁয়াশ প্রকৃতির হয়। এই মাটিতে ক্যালশিয়াম ও নাইট্রোজেন কম থাকে। গুজরাটের পশ্চিমাংশ, পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে এই লবণাক্ত মাটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কচ্ছের রণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু লবণ কণা বহন করে আনে এবং ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চয় করে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল ব-দ্বীপে প্রবেশ করায় সমুদ্র উপকূলবর্তী মাটি লবণাক্ত হয়। সবুজ বিপ্লব-এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে অত্যধিক জলসেচের মাধ্যমে নিবিড় কৃষিকাজ করার ফলে উর্বর পলিমাটি লবণাক্ত হয়ে উঠছে। শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে অত্যধিক জলসেচের ফলে সরু নালির মতো অগ্রসর হয়ে মাটির উপরের স্তরে লবণ সঞ্চিত হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানার কিছু অঞ্চলে কৃষকদেরকে মাটিতে জিপসাম মিশিয়ে মাটির লবণতার সমস্যা দূর করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উদ্ভিজ্জ পদার্থযুক্ত মাটি (Peaty Soils) :

অধিক বৃষ্টিপাত ও অধিক আর্দ্রতাযুক্ত অঞ্চলে উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধি হয় বলে সেসকল অঞ্চলে এ জাতীয় মাটি দেখা যায়। এভাবে এই অঞ্চলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে মৃত জৈবপদার্থ জমা হয় এবং এটি মাটিকে হিউমাস ও জৈব উপাদানে সমৃদ্ধ করে। এই মাটিতে শতকরা 40 - 50 ভাগের মতো জৈব উপাদান থাকে। এই মাটি পুরু ও কালো রঙের হয়। অনেক স্থানে, এই মাটিতে ক্ষারও থাকে। বিহারের উত্তরাংশ, উত্তরাঞ্চলের দক্ষিণাংশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও তামিলনাড়ুর উপকূল অঞ্চলে এই মাটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

বনভূমি সৃষ্ট মাটি (Forest soils)

নামানুসারে, বনভূমি সৃষ্ট মাটি সাধারণত পরিমিত বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল যেখানে বনভূমি সৃষ্টি হয় সেখানে দেখা যায়। পার্বত্য পরিবেশের প্রকৃতির ওপর মাটির গঠন ও বুনন নির্ভর করে। উপত্যকা অঞ্চলে এই মাটি দোঁয়াশ ও পলিময় এবং উচ্চ ঢালে মোটা দানাদার হয়। হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চলে নগ্নীভবনের ফলে সৃষ্টি হয় এবং কম আর্দ্রতার জন্য এই মাটি আম্লিক। নিম্ন উপত্যকায় প্রাপ্ত এই মাটি উর্বর।

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মাটি ও তার বুনন, প্রকৃতি, রং, গুণাগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ, গাছপালাসহ ফসলের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। মাটি হল সজীব প্রক্রিয়া। অন্যসব জীবের মতো মাটির বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়, উর্বরতা হ্রাসপায় এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে পুনরায় ব্যবহারযোগ্যও হয়। বনভূমি সৃষ্ট এই মাটি অন্যান্য উপাদানের সাথে প্রতিক্রিয়া করে, যেগুলো মাটিগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৃত্তিকা অবক্ষয় (Soil Degradation)

ব্যাপক অর্থে মৃত্তিকা অবক্ষয় বলতে মাটির উর্বরতা হ্রাসকে বোঝায়। মাটির অপব্যবহারের ফলে মাটির গভীরতা ও উর্বরতা হ্রাস পেয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভারতের মাটিসম্পদ হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হল মৃত্তিকা অবক্ষয়। ভূ-প্রকৃতি, বায়ুর গতিবেগ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর স্থানভেদে মৃত্তিকা অবক্ষয়েরও পরিবর্তন হয়।

ভূমি বা মৃত্তিকাক্ষয় (Soil Erosion)

মাটির উপরিভাগ ধ্বংস হওয়াকে মাটি ক্ষয় বলে বর্ণনা করা হয়। জলপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা মাটির গঠন ও ক্ষয় প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু দু'টো প্রক্রিয়ার মধ্যে সমতা রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সূক্ষ্ম কণা অপসারণের হার ও মাটির উপরিস্তর থেকে কণা অপসারণের হার একই রকম।

কখনো-কখনো প্রাকৃতিক বা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে এই সমতা বজায় থাকে না, মাটি অপসারণ অধিক মাত্রায় হয়। মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলিও মৃত্তিকা ক্ষয়ে অনেকাংশে দায়ী। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদাও বাড়ছে। মনুষ্য বসতি, কৃষিকাজ, পশুপালন ও অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনে বনভূমি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ ধ্বংস করা হচ্ছে।

মৃত্তিকাক্ষয় ও পরিবহণের অন্যতম মাধ্যম হল জলপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ। শুষ্ক ও শুষ্কপ্রায় অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ জনিত ক্ষয় ব্যাপকভাবে

দেখা যায়। অপরদিকে, অধিক বৃষ্টিপাত ও খাড়া ঢালযুক্ত অঞ্চলে জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয় অত্যধিক দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশে জলপ্রবাহজনিত ক্ষয় ভয়ানক ও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সাধারণত গালি ক্ষয় (Gully erosion) ও সিট ক্ষয় (sheet erosion) বেশি দেখা যায়। কোনো অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের পর সিট ক্ষয় হয় এবং মাটির অপসারণ সহজে দেখা যায় না। কিন্তু এটি আরও ক্ষতিকারক কারণ এই ক্ষয় সূক্ষ্ম এবং উপরিভাগের উর্বর মাটি অপসারণ করে। খাড়া ঢালযুক্ত অঞ্চলে গালি বা নালি ক্ষয় দেখা যায়। গালি বা নালি ক্ষয় বৃষ্টিপাতের ফলে গভীরতর হয়। কৃষিজমিকে ছোটো ছোটো টুকরো করে চাষের অযোগ্য করে দেয়। গভীর গালি ও গিরিখাতযুক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে অনুর্বর ভূ-গঠন বা (Badland topography) বলে। চম্বল অববাহিকায় প্রশস্ত গিরিখাত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতেও প্রশস্ত ও গভীর গিরিখাত দেখা যায়। প্রতিবছর গিরিখাতের মাধ্যমে দেশের প্রায় 8,000 হেক্টর ভূমি নষ্ট হয়। কী ধরনের ভূমিতে গালি বা নালি ক্ষয় বেশি হয়?

ভূমি ক্ষয় বা মাটি ক্ষয় ভারতীয় কৃষির একটি প্রধান সমস্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। ক্ষয়িত পদার্থসমূহ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে নদীর তলদেশে সঞ্চিত হয়ে নদীর গভীরতা হ্রাস করে। ফলে ঘন ঘন বন্যার সৃষ্টি হয় এবং কৃষিজমি বিনষ্ট হয়।

বৃক্ষচ্ছেদন মাটিক্ষয়ের অপর একটি প্রধান কারণ। গাছের শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে বলে ভূমি ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাই নয়, গাছের পাতা ও ডালপালা মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়। ভারতের অধিকাংশ স্থান থেকে বৃক্ষচ্ছেদন করা হলেও পার্বত্য অঞ্চলে মাটি ক্ষয় ব্যাপক আকার ধারণ করে।

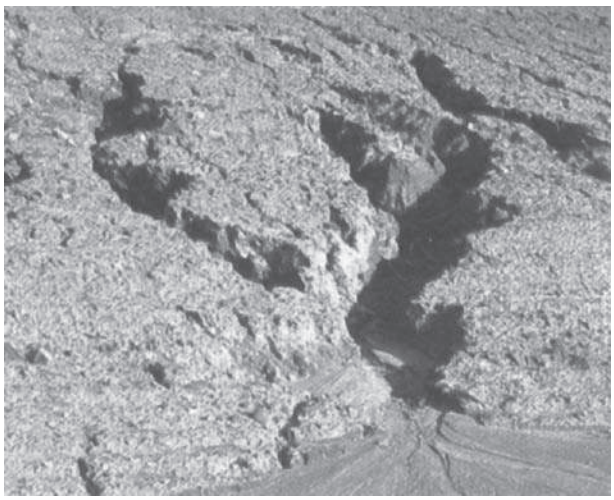

চিত্র 6.5 : মৃত্তিকা ক্ষয়

ভারতের সেচপ্রবণ অঞ্চলের বৃহৎ অংশ অতিরিক্ত সেচের ফলে লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। মাটির নিম্নস্তর থেকে লবণ বেরিয়ে আসে এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। জৈবসারের অনুপস্থিতিতে রাসায়নিক সারও মাটির জন্য ক্ষতিকর। যতক্ষণ না মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জৈবপদার্থ থাকে, রাসায়নিক সার ততক্ষণ মাটিকে কঠিনতর করে এবং দীর্ঘসময় মাটির উর্বরতা হ্রাস করে। নদী উপত্যকা পরিকল্পনা সন্নিহিত অঞ্চলে এই সমস্যা সচরাচর দেখা যায়, যদিও সবুজ বিপ্লবের শুরুতে নদী উপত্যকা পরিকল্পনা সন্নিহিত অঞ্চল প্রথমে লাভবান হয়েছিল। হিসেব অনুসারে দেশের প্রায় অর্ধেক ভূমি মৃত্তিকা অবক্ষয় প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

প্রতিবছর দেশের প্রায় মিলিয়ন টন মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকার পুষ্টিকর উপাদানও নষ্ট হয়, যা জাতীয় উৎপাদনকেও প্রভাবিত করে। তাই মৃত্তিকা বা ভূমিক্ষয় রোধ ও সংরক্ষণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

মৃত্তিকা বা ভূমি সংরক্ষণ (Soil Conservastion)

যেহেতু মৃত্তিকাক্ষয় ও মৃত্তিকার উর্বরতা মানুষের দ্বারা নষ্ট হয়, তাই অনুমান করা হয় যে, মানুষের দ্বারাই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃতি নিজস্ব নিয়মে তার ভারসাম্য বজায় রাখে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে প্রকৃতি মানুষকে তার নিজের আর্থিক বিকাশের সুযোগ করে দেয়। মৃত্তিকা সংরক্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখা যায়। মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, নির্জীবতা প্রতিরোধ ও মৃত্তিকা অবক্ষয়রোধ করতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

মৃত্তিকাক্ষয় মূলত মানুষের ত্রুটিপূর্ণ কাজ ও আগ্রাসী মনোভাবের জন্য হয়। উন্মুক্ত ভূমিতে ঢাল বরাবর চাষ হল মৃত্তিকা সংরক্ষণের প্রথম পদক্ষেপ। সাধারণত শতকরা 15 - 25 ভাগ খাড়া ঢালযুক্ত ভূমিতে চাষাবাদ করা অনুচিত। যদি কৃষিকাজ করতেই হয় তবে বৈজ্ঞানিকভাবে ধাপ কৃষি পদ্ধতিতে চাষ করা উচিত। মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ ও স্থানান্তর কৃষি ভারতের ভূমিভাগের স্বাভাবিক আবরণকে প্রভাবিত করে এবং ব্যাপকভাবে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় শীঘ্র নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এজন্য গ্রামবাসীদেরকে শিক্ষিত করে এর গুরুত্ব বোঝানো উচিত। মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য ভূমির ঢাল বরাবর চাষ, পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ, বনভূমি ও তৃণভূমি সৃষ্টি, মিশ্র কৃষি ও শস্যাবর্তন, পতিত ও অনাবাদি জমিকে ব্যবহারের উপযোগী করা প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

নালি বা গালি ক্ষয় প্রতিরোধ এবং তাদের গঠন নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ধাপ কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সরু বা ফিঙ্গার গালি (Finger gully) প্রতিরোধ করা যেতে পারে। বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলপ্রবাহের গতিরোধ করে বৃহৎ গালি ক্ষয় নিয়ন্ত্রন করা যায়। গালি ক্ষয় বৃদ্ধি রোধ করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। গালি বন্ধ করা, ধাপ কৃষি, গাছপালা ও তৃণ দিয়ে ভূমি আচ্ছাদনের মাধ্যমে গালি ক্ষয় প্রতিরোধ করা যায়।

চিত্র 6.6 : ধাপ কৃষি পদ্ধতি

শুষ্ক ও শুষ্কপ্রায় অঞ্চলে বৃক্ষ ও বনভূমি বিস্তারের মাধ্যমে বালিয়াড়ির প্রসার রোধ করা যায় এবং কৃষি বনায়নের পরিমাণ বাড়ানো যায়। কৃষির অনুপযোগী ভূমিকে পশুচারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় শুষ্ক অঞ্চল গবেষণা কেন্দ্র (Central Arid Zone Research Institute, CAZRI) দ্বারা পশ্চিম রাজস্থানে বালিয়াড়ির প্রসার রোধ করা হয়েছে।

ভারত সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড (Central Soil Conservation) গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলো জলবায়ুর অবস্থা, ভূমির আকৃতি এবং জনগণের সামাজিক ব্যবহারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। তবে এই পরিকল্পনাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত হয়। এজন্য সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাকে মৃত্তিকা সংরক্ষণের সর্বোত্তম কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়। মৃত্তিকার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ করা প্রয়োজন। ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করে ভূমির সঠিক ব্যবহারে সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে মৃত্তিকা সংরক্ষণে জনগনকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। মৃত্তিকা থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেতে হলে খুব সর্তকতার সাথে কৃষি ও চাষাবাদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে। তাহলেই সকল সুবিধা পাওয়া যাবে।

অনুশীলনী

1। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

ক) নীচের কোন্ মৃত্তিকা সর্বাধিক দেখা যায় এবং উৎপাদনশীল ?
অ) পলিমাটি আ) কালো মাটি
ই) ল্যাটেরাইট মাটি ঈ) বনভূমি সৃষ্ট মাটি

খ) কোন্ মৃত্তিকার অপর নাম 'রেগুর মৃত্তিকা' বা 'রেগুর মাটি'?
অ) লবণাক্ত বা উপকূলীয় মাটি আ) শুষ্ক বা মরু অঞ্চলের মাটি
ই) কৃষ্ণ মাটি ঈ) ল্যাটেরাইট মাটি

গ) নীচের কোন্‌টি ভারতের মৃত্তিকা ক্ষয়ের মূল কারণ ?
অ) বায়ুপ্রবাহজনিত ক্ষয় আ) জলপ্রবাহজনিত ক্ষয়
ই) রাসায়নিক, খনিজ বা বৃষ্টির জল দ্বারা ক্ষয় ঈ) কোনোটিই না

ঘ) ভারতের সেচসেবিত আবাদি জমি নীচের কোন্ কারণটির ফলে লবণাক্ত হয়ে যায়?

অ) জিপসামযুক্ত হয়ে আ) অতিরিক্ত পশুপালনের ফলে

ই) অতিরিক্ত জলসেচ ঈ) সার প্রয়োগের ফলে

2। 30 টি শব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক) মৃত্তিকা বলতে কী বোঝ?

খ) মৃত্তিকা গঠনের প্রধান কারণ গুলো কী কী?

গ) মৃত্তিকা পরিলেখর তিনটি স্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

ঘ) মৃত্তিকা অবক্ষয় বলতে কী বোঝ?

ঙ) খাদর ও ভাঙ্গার -এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

3। নীচের প্রশ্নগুলো 125 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

ক) কালো মাটি বলতে কী বোঝ। এই মৃত্তিকার গঠন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

খ) মৃত্তিকা সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ। মৃত্তিকা সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি লেখো।

গ) কোনো একটি বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা উর্বর বা অনুর্বর তা কী করে বুঝবে?
স্বাভাবিকভাবে উর্বর মৃত্তিকা ও কৃত্রিমভাবে উর্বর মৃত্তিকার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

প্রকল্প / কাজ :

i) তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করো এবং মৃত্তিকার একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

ii) ভারতের রেখা মানচিত্রে যে সকল স্থানে নিম্নলিখিত মাটি দেখা যায় তা চিহ্নিত করো -

ক) লাল মাটি

খ) ল্যাটেরাইট মাটি

গ) পলিমাটি

একক IV

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় : কারণ, প্রভাব এবং ব্যবস্থাপনা

এই এককের আলোচিত বিষয়গুলো হল

* বন্যা ও খরা
* ভূমিকম্প এবং সুনামি
* ঘূর্ণবাত
* ভূমিধস

অধ্যায়

7

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়

NATURAL HAZARDS AND DISASTERS

তোমরা নিশ্চয় সুনামি সম্পর্কে পড়েছ বা সুনামির পরবর্তী ভয়াবহ চিত্র দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছ। নিয়ন্ত্রণরেখা (Line of Control) -র উভয় পাশে কাশ্মীরের ভয়াবহ ভূমিকম্প সম্পর্কেও তোমরা অবগত। ভূমিকম্পের ফলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয় বলে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল থেকে মানুষদের সরানো হয়। এই ভূমিকম্প কী এবং কী কারণে সংঘটিত হয়? আমরা নিজেদের কীভাবে বাঁচাব? এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জেগে ওঠে। এই অধ্যায়ে আমরা এমন ধরনের কিছু প্রশ্ন সম্পর্কে পর্যালোচনা করব।

প্রকৃতির নিয়ম হল পরিবর্তন। এটি একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা কতগুলো বিরামহীন ঘটনার সমন্বয় এবং আমাদের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, বস্তুগত ও অবস্তুগতভাবে জড়িত থাকে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রাবল্য, তীব্রতা এবং স্কেল প্রভৃতির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। ভূমিরূপ এবং জীবজগতের এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে হতে পারে। অনুরূপভাবে শিলাবৃষ্টি, টর্নেডো, ধূলিঝড় প্রভৃতি দ্বারা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধও হতে পারে। শুধু তাই নয়, এটা বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও ওজোন স্তর হ্রাস করে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ও ঘটাতে পারে।

আবার পরিবর্তনের পরিভাষা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। কোনো ব্যক্তি তার প্রত্যাশা অনুসারে পরিবর্তনকে কীভাবে উপলব্ধি করতে চাইছে তার ওপর নির্ভর করে। প্রকৃতির সম্ভাব্য পরিবর্তন মান নিরপেক্ষ (এখানে ভালো বা খারাপ নেই)। কিন্তু মানুষের প্রত্যাশানুযায়ী এগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋতু পরিবর্তন, ফল পাকা প্রভৃতি কিছু পরিবর্তন ভালো ও প্রত্যাশিত হলেও ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি পরিবর্তন খারাপ ও অপ্রত্যাশিত বলেই বিবেচিত হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যেসকল পরিবর্তনগুলো খারাপ বলে বিবেচিত এবং দীর্ঘসময় ধরে মানবজীবনের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত সেসকল পরিবর্তনগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

> তোমরা যে পরিবেশে বসবাস কর সেই পরিবেশের দীর্ঘসময়ব্যাপী পরিবর্তন এবং স্বল্প সময়ে পরিবর্তনের একটি তালিকা তৈরি করো। তোমরা কি জান কোনো পরিবর্তন কীভাবে ভালো বা খারাপ বলে বিবেচিত হয়? তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে পরিবর্তনগুলো ভালো বা খারাপ পরিবর্তন বলে বিবেচিত, তার একটি তালিকা তৈরি করো এবং ভালো বা খারাপ কেন তার কারণগুলোও বের করো।

সাধারণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এমন কিছু পরিবর্তন হয় যা মানবজাতি সবসময় অপছন্দ করে ও ভয় পায়। দীর্ঘদিন ধরে ভূগোল সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনায় বিপর্যয়কে প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ঙ্কর পরিণতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতির এই শক্তির সামনে মানুষ অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায়। তবে বিপর্যয়ের কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি নয়, মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলেও বিপর্যয় হয়। মানুষের কিছু কাজ বিপর্যয়ের জন্য প্রত্যক্ষরূপে দায়ী, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, চারনোবিল পরমাণু বিপর্যয়, যুদ্ধ, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন নির্গমন (CFC) এবং গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি, শব্দ-বায়ু-জল-মাটি

> **বিপর্যয় কী?**
>
> বিপর্যয় হল মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘটমান বড়ো ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। কোনো পূর্বাভাস ছাড়া আকস্মিক ও খুব দ্রুত মানবজীবনে তার প্রভাব ফেলে। এই ঘটনার ভয়াবহতায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়, অনেকে আহত হয় এবং অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। অতএব জরুরিকালীন পরিসেবায় বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

দূষণের মতো বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষরূপে বিপর্যয় ডেকে আনে। এছাড়া মানুষের আরও কিছু কাজ অপ্রত্যক্ষভাবে বিপর্যয়কে দ্রুত ত্বরান্বিত করে। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে ভূমিধস ও বন্যা, ভূমির অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার, অস্থিতিশীল অঞ্চলে নির্মাণকাজ প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষরূপে বিপর্যয় ঘটায়। তোমাদের চারপাশ ও বিদ্যালয় সংলগ্ন অঞ্চলে মানুষের এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ অদূর ভবিষ্যতে কী কী বিপর্যয় ঘটাতে পারে তা খুঁজে বের করতে পারবে? এই বিপর্যয় প্রতিরোধের কোনো উপায় কি তোমরা জান? সাধারণত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়গুলোর সংখ্যা ও ব্যাপকতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ সকল ঘটনা প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রোধ ও কমানোর জন্য প্রচেষ্টা চলছে। যদিও সফলতা নামমাত্র ছিল, তবে মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়গুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো প্রতিরোধ করার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। ভারতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থা গঠন (National Institute of Disaster Management), 1993 সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো পৃথিবীর শীর্ষ সম্মেলন এবং 1994 সালে জাপানের ইয়োকোহামায় বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশ্ব সম্মেলন প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুযোর্গকে একে অপরের পরিপূরকরূপে ব্যবহার করছেন। যদিও এগুলো পরস্পর থেকে পৃথক কিন্তু উভয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অতএব, দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা খুবই প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন একটি উপাদান যার দ্বারা মানুষ ও সম্পদ উভয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশগত এই পরিবর্তন দ্রুত বা স্থায়ী হতে পারে। যেমন - সমুদ্র স্রোত, খাড়া ঢাল, হিমালয়ের অস্থিতিশীল ভূ-গঠন এবং মরুভুমি বা তুষারাবৃত অঞ্চলের চরমভাবাপন্ন জলবায়ু প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় অকস্মাৎ ঘটে এবং প্রচণ্ড বিধ্বংসী রূপ নেয়। মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে সমাজজীবনে তার প্রতিকূল প্রভাব ফেলে এবং এই বিপর্যয় মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কোনো ঘটনা দ্বারা যখন ধ্বংসের পরিমাণ এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতি খুব বেশি হয় তখন তাকে বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত করা হয়।

বিশ্বব্যাপী সকল মানুষেরই বিপর্যয় সম্পর্কে সাধারণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে দুটো বিপর্যয় কখনও একরকম হয় না এবং একে অপরের সঙ্গে তুলনাযোগ্যও নয়। প্রতিটি বিপর্যয় স্থানীয় সামাজিক পরিবেশগত কারণ অনুসারে অনন্য, যা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী এর থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে। যাইহোক, উপরের উল্লিখিত মতামত তিনটি প্রধান বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিস্তৃতি, তীব্রতা, পুনরাবৃত্তি এবং বিধ্বংসীরূপ বছর বছর বাড়ছে। দ্বিতীয়ত মানুষের দ্বারা সৃষ্টি বিপদ মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে যাতে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হ্রাস করা যায় এবং পরিশেষে, বছরের পর বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষের ধারণাও পরিবর্তিত হচ্ছে। পূর্বে, দুর্যোগ ও বিপর্যয়কে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং অর্ন্তবর্তী ঘটনা বলে বিবেচনা করা হত। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চলে বিপর্যয় আরও দুর্বল ছিল। এজন্য মানুষ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সূক্ষ্ম ভারসাম্য অনধিকার হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকত। এইসব অঞ্চলে মানুষ তাদের কাজের ব্যাপকতা কমিয়ে আনে। এরফলে বিপর্যয়ের বিধ্বংসীরূপও কমে যায় অপরদিকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানলাভের ফলে মানুষ প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করার বিশাল ক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমানে মানুষ দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে তাদের কাজের প্রাধান্য বিস্তার করায় বিপর্যয়ের ঝুঁকিও বেড়েছে। বেশির ভাগ নদী- বন্যাপ্রবণ সমভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন এবং বড়ো বড়ো শহর ও বন্দর - শহর যেমন - মুম্বাই এবং চেন্নাই উপকূল ও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা বেশি হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন এবং সুনামির সৃষ্টি হয়।

বিগত 60 বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বারোটি ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুযোর্গের ফলে মৃত্যুর ব্যাপকতা দেখানো হয়েছে যা 7.1 সারণিতে দেখানো হল।

প্রদত্ত সারণি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বিভিন্ন পযার্য়ে প্রচেষ্টা চলছে। এটাও উপলব্ধি করা যায় যে, বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্টি ক্ষয়ক্ষতিগুলোর প্রতিফলন বিশ্বব্যাপী এবং কোনো দেশ বা জাতির পক্ষে এককভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা অসম্ভব। এজন্য 1989 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UN) এক সাধারণ সভায় (General Assembly) এই সমস্যার কথা উত্থাপন করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, 1994 সালের মে মাসে জাপানের ইয়োকোহামা-তে 'বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশ্ব সম্মেলন (World Conference on Disaster Management)' গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এটি 'ইয়োকোহামা রণনীতি' এবং নিরাপদ বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (Yokohama strategy & plan of action for a safer world) হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রকারভেদ
Classification of Natural Disasters

বিশ্বের সকল অংশের মানুষের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, এর সম্মুখীন হয়েছেন এবং এর সাথেই বসবাস করছেন। বর্তমানে মানুষ এসকল বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং বিপর্যয় প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষতার সাথে বিপর্যয়কে শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিভাগ করার জন্য কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (সারণি 7.2)

সারণি 7.2 অনুসারে, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে। এরফলে ভারতে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। নিম্নে ভারত প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ভারতের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ
(Natural Disaster and Hazards in India)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভারত প্রাকৃতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিশাল দেশ ভারতের

সারণি 7.1 : 1948 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়

বছর	অবস্থান	প্রকার	মৃতের সংখ্যা
1948	সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)	ভূমিকম্প	1,10,000
1949	চিন	বন্যা	57,000
1954	চিন	বন্যা	30,000
1965	পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	36,000
1968	ইরান	ভূমিকম্প	30,000
1970	পেরু	ভূমিকম্প	66,794
1970	পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	500,000
1971	ভারত	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	30,000
1976	চিন	ভুমিকম্প	700,000
1990	ইরান	ভুমিকম্প	50,000
2004	ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, প্রভৃতি দেশ	সুনামি	500,000*
2005	পাকিস্তান, ভারত	ভূমিকম্প	70,000*
2011	জাপান	সুনামি	15,842*

উৎস : জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি; (United Nation Environmental Programme, UNEP-1991)

* বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institute for Disaster Management), ভারত সরকার, নিউ দিল্লি প্রদত্ত সংবাদ।

সারণি 7.2 : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রকারভেদ

বায়ুমণ্ডলীয়	স্থলজ	জলজ	
প্রবল তুষার ঝড় বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় অগ্ন্যুৎপাত বজ্রপাত, খরা টর্নেডো ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় শিলাবৃষ্টি , খরা তুষারপাত, উল্লপ্রবাহ বালু শীতল প্রবাহ প্রভৃতি,	ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির ভূমিধস হিমানী সম্প্রপাত ভূমি অবনমন ভূমিক্ষয়	বন্যা জোয়ারের তরঙ্গ সমুদ্রস্রোত ঝড়ে উত্তাল তরঙ্গ সুনামি	উদ্ভিদ ও প্রাণী একইসাথে বসবাস (পঙ্গপাল, প্রভৃতি) করে। ফলে কীটপতঙ্গের উপদ্রব-ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং সংক্রামক ব্যাধি যেমন বার্ড ফ্লু, ডেঙ্গু প্রভৃতি।

ইয়োকোহামা রণনীতি এবং দশ বছরের জন্য আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় কমানোর কর্মপরিকল্পনা : ইয়োকোহামা রণনীতি এবং নিরাপদ বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা :

Yokohama Strategy & International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)
Yokohama Strategy & Plan of Action for a Safer World

জাতিসঙ্ঘের সকল রাষ্ট্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্র 1994 সালের 23-27 মে মাসে জাপানের ইয়োকোহামা শহরে আয়োজিত 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলন (World Confercnce on Natural Disaster Reduction)'-এ যোগদান করে। এখানে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় যে, বিগত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা বিভিন্নভাবে মানুষের জীবন ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমাজ জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আরও বলা হয় যে, এই বিপর্যয়ের ফলে সাধারণত গরীব ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অবস্থা খুবই করুণ। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা করা দুরূহ ব্যাপার। এজন্য ইয়োকোহামা রণনীতিতে আগামী দশবছর এবং তার পরেও এই বিপর্যয়ের ক্ষতি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় হ্রাস করার জন্য বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

i) এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি দেশের নাগরিকদের নিজের দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে সার্বভৌম দায়িত্ব রয়েছে।

ii) উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষত অনুন্নত ও চারদিক থেকে স্থলভাগ দ্বারা আবদ্ধ দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

iii) মনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃতিক বির্পযয় প্রতিরোধ, হ্রাস বা তৎপরতা সাথে মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় ক্ষমতা ও দক্ষতাগুলো উন্নত ও শক্তিশালী করার সাথে সাথে বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থা বা স্থানীয় জনগণকেও সংগঠিত করতে হবে।

iv) উপআঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় ও অন্যান্য বিপর্যয় প্রতিরোধ, হ্রাস ও কমানোর লক্ষ্যে যে সকল বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেগুলো হল -

ক) জনগণ ও প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ,

খ) প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের প্রচার ও ব্যবহার এবং

গ) সম্পদের কেন্দ্রীয়করণ প্রভৃতি।

1990 - 2000 দশককে 'আর্ন্তজাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হ্রাস দশক (International Decade for National Disaster Reduction IDNDR)' বলে ঘোষণাও করা হয়েছে।

বিশাল ভূ-প্রাকৃতিক আয়তন, বৈচিত্র্যম পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বিবিধতার জন্য বিশেষজ্ঞগণ ভারতকে 'ভারতীয় উপমহাদেশ' এবং 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যময় ভূমি' রূপে বিভূষিত করেছেন। ভারতের বিশাল আকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা, দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক অতীত, সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্যময়তা, সর্বোপরি বিপুল জনসংখ্যার চাপ দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রভাবিত করে। এই পর্যবেক্ষণগুলো থেকে ভারতের কয়েকটি মুখ্য বিপর্যয়ের বর্ণনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট রূপে ধারণা লাভ করা যাবে।

ভূমিকম্প (Earthquakes)

ভূমিকম্প হল সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ও অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়। ভূমিকম্পের কারণগুলো সম্পর্কে 'প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতন্ত্র' (Fundamentals of Physical Geography, NCERT 2006) -এ তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। টেকটনিক পাতের সংযোগস্থলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। উৎস স্থলে ভূমিকম্প অত্যন্ত বিধ্বংসী রূপ নেয় এবং ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে তার প্রভাব দেখা যায়। ভূ-ত্বক গঠনকারী পাতসমূহের ক্রমাগত সঞ্চরণের ফলে হঠাৎ প্রবল সক্রিয়তার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এগুলোর তুলনায় অগ্ন্যুৎপাত, শিলাধস, ভূমিকম্প, ভূমি অবনমন, বিশেষত খনি অঞ্চল,

বাঁধ ও জলধারার সন্নিহিত অঞ্চলে ভূমিকম্প হলেও ততটা ধ্বংসাত্মক হয় না।

চিত্র 7.1: ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অট্টালিকা

পূর্বেই এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় পাত প্রতিবছর উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে এক সেন্টিমিটার করে অগ্রসর হয়। এই উত্তরমুখী সঞ্চরণে ইউরেশীয় পাত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এর ফলে উভয় পাত পরস্পর আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সময়ে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে ক্রমাগত প্রবল সক্রিয়তার , সৃষ্টি করে। ভূগর্ভস্থ চাপের ফলে আবদ্ধ পাত দুটি ভেঙে যায় এবং অকস্মাৎ সৃষ্ট এই সক্রিয়তার ফলে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা প্রভাবিত কয়েকটি প্রধান রাজ্য হল জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য।

এসকল অঞ্চল ছাড়াও ভারতের মধ্যে পশ্চিমাংশ, বিশেষত গুজরাট (1891, 1956 এবং 2001) এবং মহারাষ্ট্রে (1967 এবং 1993) তীব্র ভূমিকম্প হয়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানীগণ দীর্ঘসময় ধরে গবেষণা করেও উপদ্বীপীয় অংশের প্রাচীনতম অত্যন্ত সুস্থিত ও পরিণত ভূমিরূপে ভূমিকম্পের যথাযথ কারণ অনুসন্ধানে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। সাম্প্রতিককালে, কয়েকজন ভূ-বিজ্ঞানী এসম্পর্কে গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মহারাষ্ট্রের লাতুর এবং ওসমানাবাদের নিকট ভীমা(কৃষ্ণা) নদী বরাবর ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং ফাটল দিয়ে ব্যাপক শক্তি নির্গমনের ফলে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতীয় পাত ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (চিত্র 7.2)।

ন্যাশনাল জিওফিজিকেল ল্যাবরেটরি, জিওলজিকেল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ডিপার্টমেন্ট এফ মেটেওরোলোজি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথে সম্প্রতি ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (National Institute of Disaster Management) মিলিত হয়ে বিগত বছরগুলোতে ভারতে ঘটে যাওয়া 1200 টি ভূমিকম্প নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করে এবং এর ভিত্তিতে ভারতকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে ভাগ করে :

i) অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র
ii) অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র
iii) মাঝারি ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র
iv) অল্প ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র
v) অতি অল্প ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র

এগুলো ছাড়া আরও দুটো ক্ষেত্রে ভারতে ব্যাপক ভূমিকম্প অনুভূত হয়। চিত্র 7.2 তে প্রদর্শিত ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলো হল উত্তর - পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ, বিহারের দারভাঙ্গা ও আরারিয়া বরাবর ইন্দো-নেপাল সীমান্ত, উত্তরাঞ্চল, হিমাচল প্রদেশের পশ্চিমাংশ (ধরমশালার চতুর্দিকে) এবং হিমালয়ের কাশ্মীর উপত্যকা ও গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলো অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত। অনুরূপভাবে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের কিয়দংশ, পাঞ্জাবের উত্তরাংশ, হরিয়ানার পূর্বাংশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং বিহারের উত্তরাংশ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রের অর্ন্তগত। ভারতের অবশিষ্টাংশ মাঝারি থেকে অতি অল্প ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সুস্থিত ভূমিভাগের অধিকাংশ স্থান ভূমিকম্প থেকে সুরক্ষিত বলে বিবেচনা করা হয়।

ভূমিকম্পের ফলে সমাজ -পরিবেশগত প্রভাব (Socio-Environmental Consequences of Earthquakes)

ভূমিকম্প সম্পর্কে জনমনে প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্ক সঞ্চার হয়েছে কারণ কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই আকস্মিক ও তীব্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এটি ছড়িয়ে পড়ে। অধিক জনঘনত্বযুক্ত অঞ্চলে যখন

সারণি 7.3: ভূমিকম্পের প্রভাব

ভূমিভাগে	মনুষ্যনির্মিত বস্তুতে	জলভাগে
ফাটল	ফাটল বা চিড় ধরা	তরঙ্গ
জনবসতি	পিছলে পড়া	জল-গতিশীল
ভূমিধস	উল্টে যায় বা বিনষ্ট হয়	চাপ
তরলীকরণ	গ্রন্থিবদ্ধ করা	সুনামি
ভূ-চাপ	পতন	সম্ভাবনাময়
সম্ভাবনাময়	সম্ভাবনাময়	শৃঙ্খলিত প্রভাব
শৃঙ্খলিত প্রভাব	শৃঙ্খলিত প্রভাব	

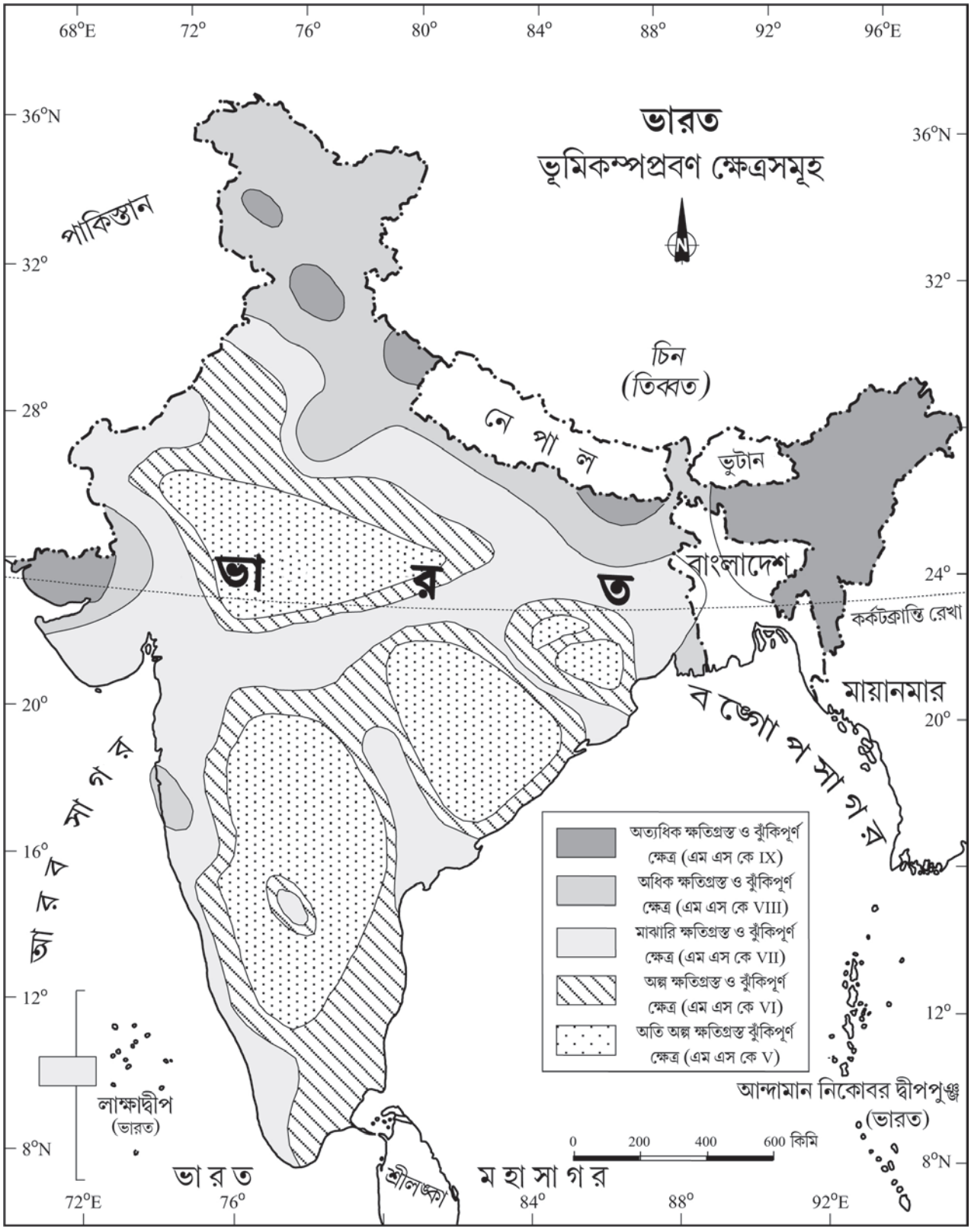

চিত্র 7.2 : ভূমিকম্পপ্রবণ ক্ষেত্রসমূহ

ভূমিকম্প হয় তখন তা ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এটি শুধুমাত্র জনবসতি, আবাসস্থল, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প কারখানা বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের ধ্বংসই করে না,বংশ পরম্পরায় সংরক্ষিত সম্পত্তি, সমাজ-সংস্কৃতিও বিনষ্ট করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে। এরফলে তারা গৃহহীন হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয় এবং আর্থিক ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এর ফলে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্পের ফলাফল (Effects of earthquake)

যে সকল অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় সেসকল অঞ্চলে তার বিধ্বংসী প্রভাব দেখা যায়। এর কিছু মুখ্য প্রভাব 7.3 সারণিতে দেওয়া হল - এছাড়াও পরিবেশের উপর ভূমিকম্পের বিপজ্জনক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায়। ভূমিকম্পের ফলে ভূ-গর্ভস্থ গলিত পদার্থ বা জল ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে এবং সন্নিহিত অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস হয়ে থাকে। এর ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাধার সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সন্নিহিত অঞ্চলে বন্যা ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্পজনিত বিপর্যয় প্রশমন (Earthquake Hazard Mitigation)

অন্যান্য বিপর্যয় থেকে ভূমিকম্প অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক কারণ এর ফলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিনষ্ট হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে উদ্ধার করা ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো কষ্টকর হয়। যেহেতু ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তাই এর বিকল্প হিসেবে এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা এবং এরফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমাণ কমানোর জন্য নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে :

i) ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Seismological centres) স্থাপন করে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ভৌগোলিক অবস্থান পদ্ধতি (Geographical positioning System) -এর সহায়তায় পাত সঞ্চরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ii) দেশের ভূমিকম্পন প্রবণ অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করে জনসাধারণকে তার আগাম সূচনা দিতে হবে। বিপর্যয় প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করতে হবে।

iii) ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের বাড়িঘরের ধরন ও অট্টালিকা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। এসকল অঞ্চলে অত্যুচ্চ অট্টালিকা, বৃহদায়তন শিল্পকারখানা স্থাপন বা শহরীকরণের প্রবণতা কমাতে হবে।

iv) পরিশেষে, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে ভূমিকম্প নিরোধক গৃহ নির্মাণ এবং হালকা নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার অত্যাবশ্যক করা।

সুনামি (Tsunami)

সমুদ্রের তলদেশে অকস্মাৎ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উপরিভাগের জলরাশিতে উঁচু উল্লম্ব তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই উল্লম্ব তরঙ্গকে সুনামি (পোতাশ্রয় তরঙ্গ) বা ভূকম্পীয় সমুদ্র তরঙ্গ বলে। সাধারণত তাৎক্ষণিক উল্লম্ব তরঙ্গের ফলে ভূ-কম্পীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রারম্ভিক ব্যাঘাতের পর সমুদ্রজলে তরঙ্গের একটি শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, কারণ তখন প্রারম্ভিক তরঙ্গের উপরিভাগ এবং তলদেশের সঞ্চিত জলরাশি স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য আন্দোলিত হয়।

জলের গভীরতার ওপর মহাসাগরীয় জল তরঙ্গের গতি নির্ভর করে। গভীর মহাসাগর অপেক্ষা অগভীর মহাসাগরে এই গতি বেশি হয়। ফলস্বরূপ, মহাসাগরের অন্তঃস্থলে সুনামির প্রভাব কম দেখা যায় এবং উপকূল ও সন্নিহিত অঞ্চলে তার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। এজন্য সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে সুনামির তেমন প্রভাব দেখা যায় না। এর কারণ হল গভীর সমুদ্রে সুনামি শনাক্ত করাও দুরূহ। এটা এজন্য যে, গভীর সমুদ্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব বেশি হয় এবং তরঙ্গ উচ্চতা কম হয়। ফলে অগভীর অংশে সুনামি তরঙ্গ কয়েক মিনিটের জন্য জাহাজকে এক বা দুই মিটার পর্যন্তই সমুদ্রতল থেকে ওপরে ওঠাতে পারে। অপরদিকে, সুনামি যখন অগভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকে, সময় একই থাকেলেও তরঙ্গের উচ্চতা বাড়তে থাকে। কখনো - কখনো এই উচ্চতা 15 মিটার বা তার বেশিও হতে পারে। যার ফলে উপকূল অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এজন্য তাকে **অগভীর জল তরঙ্গও** (Shallow water waves) ও বলে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা, বিশেষত: আলস্কা উপকূল, জাপান, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহ, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভারত প্রভৃতি স্থানে সুনামি প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়।

উপকূলে পৌঁছে সুনামি তরঙ্গ থেকে আরও অনেক শক্তি নির্গত হয় এবং সমুদ্র জল প্রবলবেগে প্রবেশ করে বন্দর শহর ও নগর, স্থাপত্য ইমারত ও অন্যান্য বসতিকে বিনষ্ট করে। সুদূর অতীত থেকে বিশ্বব্যাপী উপকূল অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক সুযোগ থাকায় ঘন জনবসতি দেখা যায়। আবার উপকূল

অঞ্চলে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষা সুনামি দ্বারা মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তিও অনেক বেশি নষ্ট হয়। সুনামি দ্বারা ঘটে যাওয়া ও বিপর্যয়ের মূল্যায়ন তোমরা 'ব্যবহারিক ভূগোল, ভাগ 1(Practical Work in Geography-Part - I, NCERT, 2006)' তে প্রদত্ত বান্দা এচে (Banda Aceh) ইন্দোনেশিয়ার প্রদর্শিত চিত্র থেকে জানতে পারবে।

চিত্র 7.3 : সুনামি প্রভাবিত অঞ্চল

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা সুনামির দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কারণ এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

কোনো একটি দেশ বা সরকারের পক্ষে সুনামির মতো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা সম্ভবপর নয়। এজন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সুনামিজাতীয় বিপর্যয়ের সাথে মোকাবিলা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। 2004 সালের 26 ডিসেম্বরের সুনামিতে 3 লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনহানি ঘটলে যৌথ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়। 2004 সালের ডিসেম্বরের এই সুনামির পর ভারত আন্তর্জাতিক সুনামি সচেতনতা তন্ত্রে (International Tsunami Warning System) যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত (Tropical Cyclone)

সাধারণত 30° উত্তর এবং 30° দক্ষিণ অক্ষাংশের অধিক বায়ুপ্রবাহজনিত অঞ্চল যেখানে নিম্নচাপ বিরাজ করে সেখানে উষ্ণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয়। অনুভূমিকভাবে এই বায়ু 500-1000 কিমি পর্যন্ত এবং উল্লম্বভাবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 12-14 কিমি পর্যন্ত প্রসারিত। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বা হ্যারিকেন একটি তাপীয় ইঞ্জিনের মতো, পুঞ্জীভূত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সাগর-মহাসাগরের জলের বাষ্পীভবন ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়ে লীনতাপ মুক্ত হয়ে ঘূর্ণবাতে শক্তি সরবরাহ করে। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের শক্তি নির্ভর করে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর ঘনীভবনের ফলে উৎপন্ন লীনতাপের (Latent Heat) ওপর। (সাধারণত গ্রীষ্মের শেষ ও শরতের শুরুতে উষ্ণ ক্রান্তীয় সমুদ্রে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত উৎপন্ন হয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করে জলীয় বাষ্প ও লীনতাপের যোগান বন্ধ হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে)।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের গঠন ও উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের উৎপত্তির জন্য নিম্নলিখিত প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা আবশ্যক :

i) পর্যাপ্ত পরিমাণে লীনতাপ (Latent heat) ত্যাগ করার জন্য উষ্ণ ও জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর অবিরাম ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ থাকা প্রয়োজন।

ii) নিম্নচাপ কেন্দ্রের ভরাট প্রতিরোধ করতে কোরিওলিস বল (Coriolis Force) শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন (নিরক্ষরেখার উভয়পাশেঃ- 5° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে কোরিওলিস বল কম থাকায় এখানে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হতে পারে না)।

iii) ট্রপোস্ফিয়ার স্তরের পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বিকাশ লাভ করে এবং স্থানীয় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

iv) পরিশেষে, শক্তিশালী উল্লম্ব বায়ুকেন্দ্র (Wind Wedge) লীনতাপের উল্লম্ব প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটায়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের গঠন (Structure of Tropical Cycle)

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অধিক চাপ প্রবণতা। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে অধিক উষ্ণ ও নিম্নচাপ বিরাজ করে। শান্ত, বায়ুপ্রবাহহীন, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশযুক্ত সর্বোচ্চ উষ্ণতা ও আর্দ্রতাযুক্ত বৃত্তাকার অঞ্চলকে **'ঘূর্ণবাতের চক্ষু'** (eye of the Storm) বলে। সাধারণত ঘূর্ণবাতের সময় চারপাশে সমপ্রেষরেখাগুলো পরস্পর ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যা উচ্চচাপ প্রবণতাকে নির্দেশ করে। স্বাভাবিক ভাবে এটি 14-17 মিলিবার / 100 কিমির মধ্যে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তা বৃদ্ধি পেয়ে 60 মিলিবার / 100 কিমি হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রভাগ থেকে এই বায়ু বলয়টি 10-150 কিমি পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

ভারতে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের স্থানিক ও সময়ানুগ বণ্টন (Spatto-temporal Distribution of Tropical Cyclone in India)

উপদ্বীপীয় আকৃতিবিশিষ্ট ভারত পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমদিকে আরবসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এজন্য ভারতের এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ জলভাগে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ঘূর্ণবাত

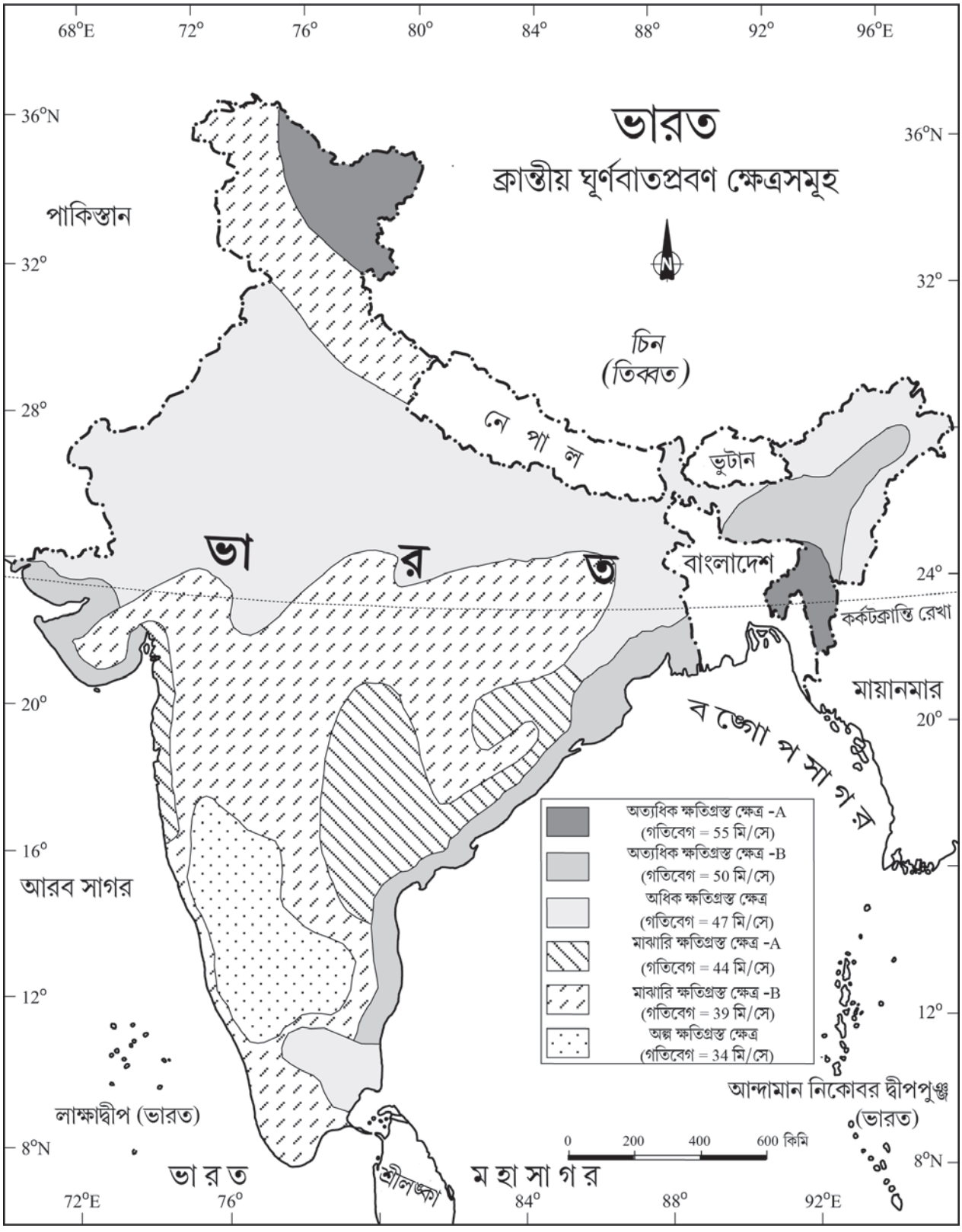

চিত্র 7.4 : ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবাতপ্রবণ ক্ষেত্রসমূহ

সারণি 7.4 : ভারতে ক্রান্তীয় ঘূর্ণি ঝড়ের পুনরাবৃত্তির হার
(Frecqueney of Cyclonic stormn in India)

মাস	বঙ্গোপসাগর	আরবসাগর
জানুয়ারি	4(1.3)*	2(2.4)
ফেব্রুয়ারি	1 (0.3)	0(0.0)
মার্চ	4(1.30)	0(0.0)
এপ্রিল	18 (5.7)	5(6.1)
মে	28 (8.9)	13 (15.9)
জুন	34 (10.8)	13(15.9)
জুলাই	38 (12.1)	3(3.7)
আগস্ট	25 (8.0)	1(1.2)
সেপ্টেম্বর	27(8.6)	4(4.8)
অক্টোবর	53(16.9)	17(20.7)
নভেম্বর	56.(17.8)	21(25.6)
ডিসেম্বর	26 (8.3)	3(3.7)
সর্বমোট	**314 (100)**	**82(100)**

** বন্ধনীতে প্রদত্ত তথ্য বছরব্যাপী সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ের শতকরা হার*

বর্ষাকালে 10° - 15° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে উৎপন্ন হলেও বঙ্গোপসাগরে অক্টোবরে ও নভেম্বর মাসে অধিকাংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সংঘটিত হয়। এখানে এই ঘূর্ণবাত 16° - 21° উত্তর অক্ষাংশ এবং 92° পূর্ব দ্রাঘিমাতে সৃষ্টি হয়। কিন্তু জুলাই মাসে এই ঘূর্ণবাত সুন্দরবনের নিকট 18° উত্তর অক্ষাংশ এবং 90° পূর্ব দ্রাঘিমায় পশ্চিমে স্থানান্তরিত হয়। 7.4 সারণিতে ভারতে ঘূর্ণবাতের পুনরাবৃত্তি ও সময় দেখানো হয়েছে।

বায়ু, সমুদ্র ও স্থলভাগের পারস্পরিক সংযোগের ফলে উত্তাল তরঙ্গ (surge) সৃষ্টি হয়। অত্যধিক অনুভূমিক চাপ প্রবণতা ও শক্তিশালী স্থলবায়ু দ্বারা ঘূর্ণবাতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এর ফলে সমুদ্রজল উপকূলভাগে প্রবেশ করে এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন বায়ু প্রবাহিত হয় ও প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের প্রভাব
(Consequences of Tropical Cyclones)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু লীনতাপ (Latent heat) ত্যাগ করার ফলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয়। অতএব সমুদ্র থেকে দূরত্ব যত বৃদ্ধি পাবে ঘূর্ণবাতের প্রভাবও তত কমতে থাকবে। ভারতে বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগর থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ঘূর্ণবাতের শক্তিও কমতে থাকে। উপকূল অঞ্চলে প্রায়শই 180 কিমি / ঘণ্টা গতিবেগসম্পন্ন তীব্র ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সংঘটিত হয়। ফলে প্রভাবিত অঞ্চলের জলরাশি সমুদ্রতল থেকে অস্বাভাবিকভাবে উপরে ওঠে। উত্থিত এই জলরাশি জলোচ্ছাস বা ঝড়ের উত্তাল তরঙ্গ (Storm surge) নামে পরিচিত। ফলস্বরূপ মনুষ্যবসতি, কৃষিভূমি ও ফসল প্লাবনের ফলে নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, মানুষের বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তিও নষ্ট হয়।

বন্যা (Floods)

বর্ষাকালে কিছু কিছু অঞ্চল জল প্লাবিত হওয়ার খবর তোমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছ বা দুরদর্শনে বন্যা সম্পর্কিত ছবি দেখেছ। এই সময় নদীর জল স্বাভাবিক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ভূমিভাগ ও মনুষ্যবসতিতে প্লাবিত করে এবং এরফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তুলনায় বন্যার কারণ মোটামুটি সর্বজনবিদিত। বন্যা সাধারণত ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় এবং কিছু কিছু অঞ্চলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। নদীনালা, খালবিল প্রভৃতি জলপ্রবাহে জলের পরিমাণ বেড়ে ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে সেই অতিরিক্ত জল পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি বা সমতলভূমিকে প্লাবিত করে। কখনো - কখনো হ্রদ বা জলধারের জলও বর্ষাকালে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। জলোচ্ছ্বাস বা ঝড়ের উত্তাল তরঙ্গ (storm surge) - এর ফলেও উপকূল অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘসময়ব্যাপী প্রবল বৃষ্টিপাত, হিমবাহ ও বরফ স্তূপের গলন, মাটির অপ্রবেশ্যতা এবং অতিরিক্ত মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলেও বন্যা সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও বন্যা প্রায়শই পৃথিবীর বিস্তৃত ভৌগলিক অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং বিধ্বংসী আকার ধারণ করে। দক্ষিণ, দক্ষিণ - পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ,

চিত্র 7.5: বন্যার সময় বহ্মপুত্র নদ

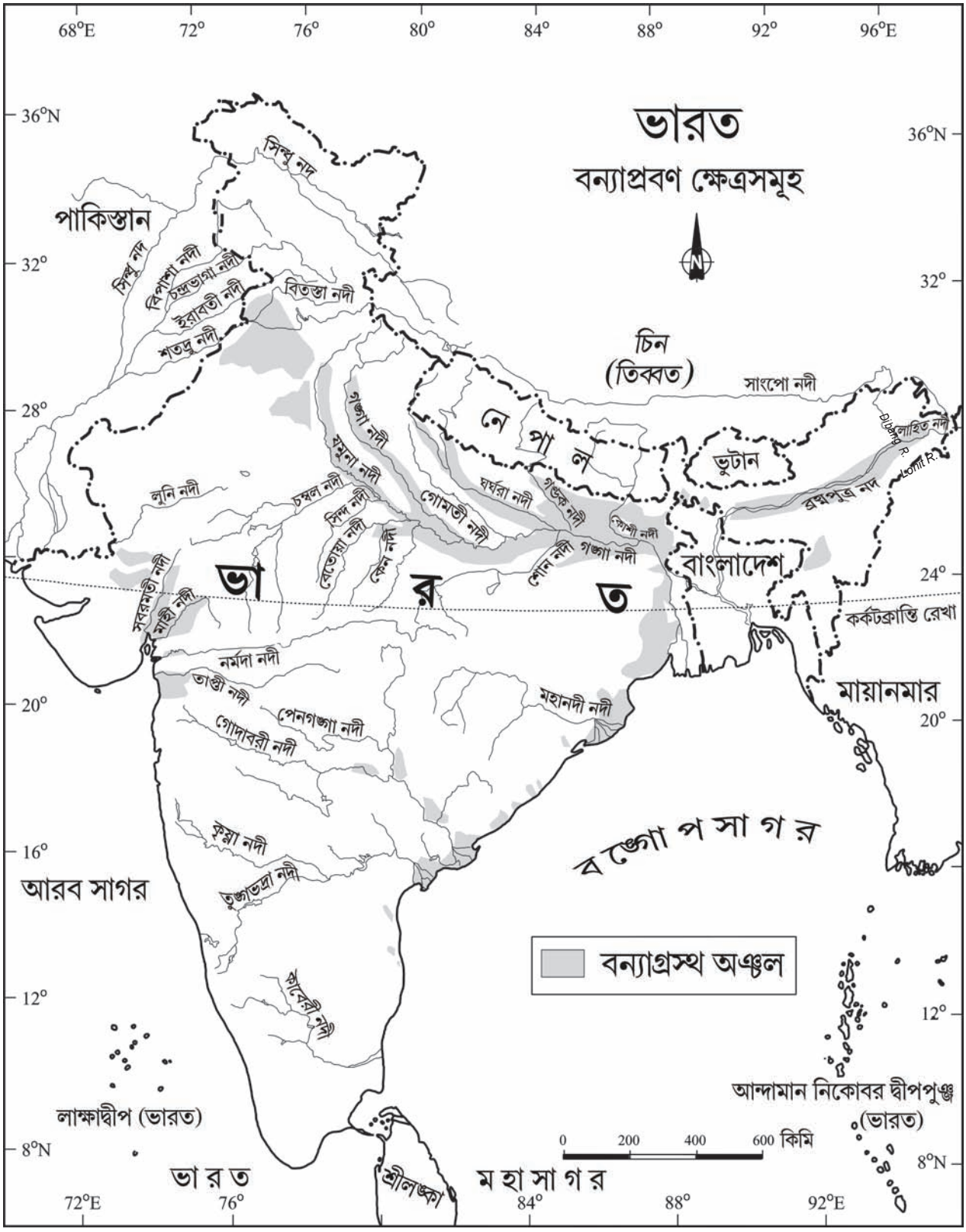

চিত্র 7.6 : বন্যাপ্রবণ ক্ষেত্রসমূহ

বিশেষত চিন, ভারত এবং বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং বিধ্বংসী রূপ নেয়।

আবার অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তুলনায় বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব ও তার বিস্তৃতিতে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষচ্ছেদন, অবৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি, স্বাভাবিক জলপ্রবাহপথে বাধা সৃষ্টি করা বা প্লাবনভূমি ও নদীগর্ভে বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে বন্যার তীব্রতা, ব্যাপকতা ও ধ্বংসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ক্রমাগত বন্যার ফলে প্রচুর জীবনহানি ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়। 'রাষ্ট্রীয় বন্যা আয়োগ' (Rastriya Barh Ayog,National Flood Commission)' ভারতের 40 মিলিয়ন হেক্টর ভূমিকে বন্যাপ্রবণ বলে চিহ্নিত করেছে। 7.6 নং চিত্রে ভারতের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলসমূহকে দেখানো হয়েছে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার ভারতের অধিক বন্যাপ্রবণ রাজ্য। এছাড়াও উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদী দ্বারা পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে মাঝে মাঝে বন্যার সৃষ্টি হয়। এটা লক্ষ করা গেছে যে, রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য গত এক দশক ধরে আকস্মিকভাবে বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। এর একটি কারণ হলো মৌসুমি বায়ুর ব্যাপকতা এবং অপরটি হল মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলে জলপ্রবাহ ও নদীপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। কখনো - কখনো নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসে প্রত্যাগমনকারী মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তামিলনাড়ুতে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বন্যার ফলাফল ও নিয়ন্ত্রণ (Consequence and Control of Floods)

ক্রমাগত প্লাবনের ফলে কৃষিভূমি এবং জনবসতি বিশেষত আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ (বন্যা - প্রবণ নদী) ও ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও গুজরাট - উপকূলে ঘূর্ণিঝড় এবং পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের উত্তরাংশ ও হরিয়ানাতে প্রতিনিয়ত বন্যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজজীবনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। প্রতিবছর বন্যার ফলে শুধুমাত্র ফসলেরই ক্ষতি হয় না, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন পরিকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট, রেললাইন, সেতু ও জনবসতিরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং বন্যার জল তাদের বিভিন্ন গৃহপালিত পশুকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যাকবলিত অঞ্চলে বিভিন্ন রোগ, যেমন - কলেরা, গ্যাস্ট্রো-অ্যান্টেরাইটিস, হেপাটাইটিস এবং বিভিন্ন জলবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও বন্যার কিছু সুফলও রয়েছে। প্রতি বছর বন্যার ফলে কৃষিভূমি প্লাবিত হয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে যা ফসল উৎপাদনে সহায়ক। প্রতিবছর ব্রহ্মপুত্র নদের জলে প্লাবিত পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলি (আসাম) উৎকৃষ্ট ধান উৎপাদনের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। তবে প্রতিবছর বন্যায় যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার তুলনায় এই সুবিধা নগণ্য।

ভারত সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও প্রতিবছর বন্যার ফলে সৃষ্টি ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত। সরকার কীভাবে এই বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে? বন্যা নিয়ন্ত্রণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেমন - বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ রোধে বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ, নদীতে বাঁধ নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ এবং বন্যাপ্রবণ নদীতে বিশেষ নির্মাণকাজে বাধাদান প্রভৃতির মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রনে রাখার চেষ্টা করা হয়। এসকল নদী অববাহিকা থেকে জনবসতি সরিয়ে সুরক্ষিত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টাও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার একটি ধাপ, বিশেষ করে দেশের পশ্চিমাংশ ও উত্তরাংশে যেখানে আকস্মিক বন্যার প্রকোপ বেশি। উপকূল অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রভাগের বসতিপূর্ণ অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খরা (Droughts)

সাধারণত যখন কোনো অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা, অত্যধিক বাষ্পীভবন, জলাধার বা অন্যান্য সঞ্চিত জলের অপরিমিত ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর কমে গেলে 'খরা'-র পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

> আবহাওয়াগত জটিল অবস্থা হল খরা। আবহবিদ্যার বিভিন্ন উপাদান যেমন, অধঃক্ষেপণ, বাষ্পীভবন, জলীয় বাষ্প নির্গমন, ভৌমজল, মাটির আর্দ্রতা, জলসঞ্চয় ও প্রবাহ, কৃষিপদ্ধতি বিশেষত উৎপাদিত ফসলের প্রকারভেদ, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত।

খরার প্রকারভেদ (Typer of Droughts)

আবহাওয়াজনিত খরা (Meteorological Droughts)

কোনো অঞ্চলে দীর্ঘসময় ধরে বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা হেতু বৃষ্টিপাত অসমভাবে বণ্টিত হয়। দীর্ঘদিন এই অবস্থার ফলে সেখানে 'খরা' পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কৃষিব্যবস্থাজনিত খরা (Agricultural Drought)

এটি মাটির আর্দ্রতাজনিত 'খরা' নামেও পরিচিত। ফসল উৎপাদনের জন্য মাটিতে যতটা আর্দ্রতা থাকা দরকার তার চেয়ে কম হলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় বা ফসল নষ্ট হয়। কিন্তু সেচসেবিত কোনো অঞ্চলে 30 শতাংশ বা তার বেশি ফসল উৎপাদিত হলে সে অঞ্চল খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয় না।

চিত্র 7.7 : খরাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

চিত্র 7.8 : খরা

জলীয় খরা (Hydrological Drought)

বিভিন্ন জল সংরক্ষণ কেন্দ্র ও জলাধার যেমন, অ্যাকুইফার, হ্রদসমূহ জলাধার প্রভৃতি স্থানের জলস্তর যদি কমে যায় তখন জলীয় খরা দেখা যায়। তবে বৃষ্টিপাত হলে সেই জল পুনরায় পূর্ণ হয়ে যায়।

পরিবেশগত খরা (Ecological Drought)

জলের অভাবে যখন বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং পরিণামস্বরূপ বাস্তুতন্ত্রে চরম অধোগতি ও ক্ষতিসাধিত হয় তখন তাকে পরিবেশগত খরা বলে অভিহিত করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সকল খরার ফলে আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ভারতের খরাপ্রবণ অঞ্চল (Drought Prone Areas in India)

ভারতের অধিকাংশ কৃষিকাজ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। ভারতের জলবায়ুর দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক হল খরা এবং বন্যা। আংশিক অনুমানের নিরিখে, প্রতিবছর ভারতের মোট ভূ- ভাগের প্রায় 19 শতাংশ ও জনসংখ্যার প্রায় 12 শতাংশ খরাকবলিত হয়। দেশের মোট 30 শতাংশ ভূমি খরাপ্রবণ বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং প্রায় 50 মিলিয়ন মানুষের ওপর এর প্রভাব পড়ে। প্রায়শই দেখা যায় যে, দেশের কোনো অংশে যখন ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ থাকে, অন্য অংশে ওই একই সময়ে তীব্র খরা সৃষ্টি হয়। উপরন্তু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটাও দেখা গেছে যে, কোনো একটি ঋতুতে কোনো একটি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অপরদিকে ওই অঞ্চলটি পুনরায় খরা দ্বারাও প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতে মৌসুমি বায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনশীলতা ও আচরণগত অনিশ্চয়তার জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। এজন্য ভারতের অধিকাংশ স্থানে খরা সাধারণ ঘটনা এবং এর ব্যাপ্তিও অনেক বেশি কিন্তু কোথাও আবার এর প্রভাব দেখা যায় না। খরা পরিস্থিতির তীব্রতা অনুযায়ী ভারতকে নিম্নলিখিত খরা প্রবণ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে:

অত্যধিক খরা প্রবণ অঞ্চল (Extreme Drought Affected Areas)

7.7 নং চিত্র থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রাজস্থানের অধিকাংশ স্থান, বিশেষত আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিমে যেমন : মরুস্থলী এবং গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চল অত্যধিক খরাপ্রবণ। এছাড়াও রাজস্থানের জয়শলমীর এবং বারমের জেলার 90 মিমির কম গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল ভারতের মরুভূমির অর্ন্তগত।

অধিক খরাপ্রবণ অঞ্চল (Severe Drought Prone Area)

রাজস্থানের পূর্বাংশ, মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ, মহারাষ্ট্রের পূর্বাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশের অভ্যন্তরভাগ ও কর্ণাটক মালভূমি, তামিলনাড়ুর উত্তরাংশের অভ্যন্তরভাগ অধিক খরাপ্রবণ অঞ্চলের অর্ন্তগত।

মাঝারি খরা প্রবন অঞ্চল (Moderate Drought Affected Area)

রাজস্থানের উত্তরাংশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিনাংশের জেলাসমূহ, গুজরাটের অবশিষ্টাংশ, কোঙ্কন ব্যাতীত মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর মালভূমি এবং কর্ণাটকের অভ্যন্তরভাগ মাঝারি খরাপ্রবণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের অবশিষ্টাংশ খরাহীন বা কম খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়।

খরার ফলাফল (Consequences of Drought)

পরিবেশ ও সমাজজীবনের ওপর খরার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। শস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে খাদ্যভাব (আকাল), পশুখাদ্যের অভাব (তৃণকাল), অপরিমিত বৃষ্টিপাতের ফলে সঞ্চিত জলের অভাব (ত্রিকাল) পরিস্থিতি ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। খরাপ্রবণ অঞ্চলে ব্যাপক আকারে গৃহপালিত ও অন্যান্য পশুর মৃত্যু হয় এবং মানুষের পরিব্রাজন এবং পশুসম্পদের পলায়ন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। জলাভাবের ফলে মানুষ দূষিত জল পান করতে বাধ্য হয়। এরফলে জলবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন - গ্যাস্ট্রো-অ্যান্টেরাইটিস, কলেরা, হেপাটাইটিস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়।

সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে খরার প্রভাব তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদি - উভয়ই হতে পারে। এজন্য তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদি উভয় দিকই বিবেচনাধীন। খরা পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, ক্ষতিগ্রস্তদের ঔষধপ্রদান এবং

গবাদি পশুর জন্য পর্যাপ্ত পশুখাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহের পাশাপাশি মানুষ ও তাদের পশুসম্পদকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অ্যাকুইফাররূপে সম্ভাব্য ভৌমজলস্তর শনাক্তকরণ, জলাভাবযুক্ত অঞ্চলে নদীর অতিরিক্ত জল সরবরাহ করা, বিশেষত নদীর অন্তর্বর্তী সংযোগ এবং জলাধার ও বাঁধ নির্মান প্রভৃতির মাধ্যমে খরার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির দীর্ঘকালীন প্রভাব মুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সম্ভাব্য ভৌমজলস্তর এবং নদী অববাহিকার সম্ভাবনাময় আন্তঃসংযোগ কেন্দ্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য দূরসংবেদন (Remote Sensing) ও উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

খরা প্রতিরোধকারী ফসল সম্পর্কে ধারণা প্রচার এবং একই বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি খরা প্রতিরোধে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতিরোধেও সহায়ক হবে। এছাড়া **বৃষ্টির জল সংরক্ষণ** ও খরার প্রভাব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

> তোমার এলাকায় বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করো এবং এগুলোকে আরও ভালোভাবে কার্যকর করার জন্য তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ভূমিধস বা ভূ-স্খলন (Landslides)

তোমরা কখন শ্রীনগর যাওয়ার রাস্তা বন্ধ বা পাথরের পতনের ফলে কোঙ্কন রেললাইন ভেঙ্গে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি হওয়ার কথা পড়েছ কি? ভূমিধসের ফলেই এরূপ হয়, যা দ্রুতগতিতে আদিশিলার নিম্নমুখী অপসারণের ফলে হয়ে থাকে। ভূমিধস অন্যান্য বিপর্যয় যেমন - ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি এবং ঘূর্ণাবাত অপেক্ষা কম দৃশ্যমান হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব কম গুরুতর নয়। বিপর্যয়সমূহ প্রধানত আকস্মিক, অনিশ্চিত এবং দীর্ঘকালীন বা আঞ্চলিক কারণসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও ভূমিধস বেশির ভাগই স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এজন্য ভূমিধস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা বা তার সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বানুমান করা শুধু দুরূহই নয়, অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষও বটে।

অনুশীলনের মাধ্যমে যথাযথভাবে ভূমিধসকে সংজ্ঞায়িত করা এবং ভূমিধস সংঘটন ও আচরণ ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ। তাসত্ত্বেও, অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে এর পৌনঃপুনিকতা এবং এই ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত কারণ, যেমন - ভূতত্ত্ব, ভূমিরূপ সংক্রান্ত উপাদান, ভূমি ঢাল, ভূমিব্যবহার, অরণ্যাবৃত এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের মতো নিয়ন্ত্রক বিষয়বস্তুগুলোর সাথে কার্যকর সম্পর্কযুক্ত। ভারতকে কয়েকটি ভূমিধস অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্রসমূহ
(Landslide Vulnerability Zone)

অত্যধিক ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্র
(Very High Vulnerability Zone)

হিমালয় এবং আন্দামান ও নিকোবর অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত খাড়া ঢালবিশিষ্ট অঞ্চল,উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ ঘন ঘন ভূ-গঠনের ফলে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলসমূহ প্রভৃতি এবং মানুষের অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ বিশেষত রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি স্থান এই অত্যধিক ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চলের অন্তর্গত।

অধিক ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্র
(High Vulnerability Zone)

অধিক ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্রে অনেকটা অত্যধিক ভূমিধস ক্ষেত্রের মত অবস্থা দেখা যায়। সংযোজন, প্রাবল্য এবং ভূমিধস নিয়ন্ত্রণের পৌনঃপুনিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রেই শুধু এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যসমূহ এবং আসাম সমভূমি ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ অধিক ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্রের অর্ন্তগত।

মাঝারি বা কম ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্র
(Moderat to Low Vulnerability Zone)

বহিঃহিমালয়ের কম বৃষ্টিপাতযুক্ত লাডাক এবং স্পিতি (হিমাচলপ্রদেশ) তরঙ্গায়িত অথচ সুস্থিত ভূ-প্রকৃতি এবং আরাবল্লী পর্বতের স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থান, পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতেও মাঝে মাঝে ভূমিধস সংঘটিত হয়। এছাড়া ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, গোয়া, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে খনন ও অবনমনের ফলে প্রায়শই ভূমিধস সংঘটিত হয়।

চিত্র 7.9 : ভূমিধস

অন্যান্য অঞ্চলসমূহ (Other Areas)

ভারতের অবশিষ্টাংশ বিশেষত রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ (দার্জিলিং জেলা ছাড়া), আসাম (কার্বিয়াংলং জেলা ছাড়া) এবং দক্ষিণাংশের রাজ্যসমূহের উপকূল অঞ্চল সমূহ ভূমিধসের দিক থেকে নিরাপদ।

ভূমিধসের ফলাফল (Consequences of Landslides)

ভূমিধসের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম এবং স্থানীয় অঞ্চল সরাসরি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু পথরোধ, রেললাইনের পাটাতন ধ্বংস এবং জলপ্রবাহে পাথর পতনের ফলে জলপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ভূমিধসের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়। এর ফলে এসকল স্থানে স্থানিক মিথস্ক্রিয়া সাধন কষ্টকর, বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার যা ওই অঞ্চলের উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপকেও বিরূপভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশমন (Mitigation)

ভূমিধস মোকাবিলা করার জন্য এলাকা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অধিক ভূমিধসপ্রবণ ক্ষেত্রে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ, যেমন - রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণকাজ সীমাবদ্ধ রাখা ও উপত্যকায় কৃষিকাজ সীমিত করে মৃদু ঢালযুক্ত ভূমিতে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বৃহদাকার জনবসতি গঠনে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করা উচিত। এছাড়া এর সহায়ক হিসেবে কিছু কাজ, যেমন - বৃহদাকারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং জলপ্রবাহ কমানোর জন্য বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি পরিপূরক কাজ করা যেতে পারে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে বহুল প্রচালিত জুমচাষের (গাছ কাটা ও পোড়ানো / স্থানান্তর কৃষি) পরিবর্তে ধাপ কৃষিপদ্ধতি অনুসরণের জন্য অনুপ্রাণিত করা প্রভৃতি।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন (Disaster Management) :

ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের তুলনায় ঘূর্ণবাত আগমনের সময় ও তার স্থান সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ঘূর্ণবাতের প্রকৃতি, প্রাবল্য, দিক এবং ভয়াবহতা সম্পর্কেও পূর্বানুমান করা যায় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়। ঘূর্ণবাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর কয়েকটি পদক্ষেপ হল, ঘূর্ণবাত নিরোধক আবাসস্থল, বাঁধ, ডাইক ও জলাধার নির্মাণ এবং বনায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে বাতাসের গতি প্রতিহত করা প্রভৃতি। তা সত্ত্বেও ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণ ঘূর্ণবাতের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিল, 2005
Disaster Management Bill - 2005

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিল, 2005 অনুসারে বিপর্যয়কে আকস্মিক বিপত্তি, দুর্ঘটনা, দুর্ভোগ বা মৃতের আলয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত বিপর্যয় আকস্মিক বা অবহেলার ফলে বেড়ে যায়। এরফলে বড়ো ধরনের জীবনহানি, ধ্বংস বা দুভোর্গ ঘটতে পারে এবং পরিবেশে তার বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য প্রভাবিত অঞ্চলের জনসাধারণের সেই পরিস্থিতির সাথে লড়াই করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত (Conclusion):

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিপর্যয় প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট - এই দুধরনের হতে পারে। সকল দুর্যোগকে বিপর্যয় বলার কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও বিপর্যয় সমূহকে চিহ্নিত করা কঠিন, বিশেষত প্রাকৃতিক বিপর্যয় অতএব পরবর্তী সহজ পদ্ধতি হল বিপর্যয় প্রশমন ও প্রস্তুতি নেওয়া। বিপর্যয় প্রশমন ও ব্যবস্থাপনের তিনটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল -

i) বিপর্যয় সম্পর্কে আগাম তথ্যসংগ্রহ ও প্রচার করা এবং সম্ভাব্য দুর্বলতর স্থানের মানচিত্র তৈরি করে জনসাধারনকে সচেতন করা প্রভৃতি। এছাড়া দুর্বলতর স্থানে বিপর্যয় পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, উদ্ধার কাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া।

ii) বিপর্যয়ের সময় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ যেমন - জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিত্যক্ত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা,ত্রাণশিবির গঠন, পানীয় জল, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

iii) বিপর্যয় পরবর্তী কাজ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলা করার উপযোগী গৃহনির্মাণে অনুপ্রাণিত করা প্রভৃতি।

ভারতের মতো দেশে এই ব্যবস্থাপনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক অবস্থান ও সেখানকার জনসাধারণের জীবন বিপর্যয়পূর্ণ। বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিল, 2005 প্রবর্তন এবং জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রতিষ্ঠান (National Institute of Disaster Management) গঠন প্রভৃতি হল ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি সঠিক পদক্ষেপ।

অনুশীলনী

1) সঠিক উত্তরটি বাছাই করো

ক) নিম্নে বর্ণিত ভারতের কোন্ রাজ্যে পৌনঃপুণিক বন্যা সৃষ্টি হয়?

অ) বিহার　　আ) পশ্চিমবঙ্গ

ই) আসাম　　ঈ) উত্তর প্রদেশ

খ) উত্তরাখণ্ডের কোন্ জেলায় মালপা ভূমিধস সংঘটিত হয়েছিল?

অ) বাগেশ্বর　　আ) চম্পাওয়াত

ই) আলমোরা　　ঈ) পিথোরাগড়

গ) নিম্নের কোন্ রাজ্য শীতকালে বন্যার সম্মুখীন হয়?

অ) আসাম　　আ) পশ্চিমবঙ্গ

ই) কেরালা　　ঈ) তামিলনাড়ু

ঘ) নিম্নের কোন্ নদীতে 'মাজুলি' নদীদ্বীপটি অবস্থিত?

অ) গঙ্গা　　আ) ব্রহ্মপুত্র

ই) গোদাবরী　　ঈ) সিন্ধু

ঙ) নিম্নের কোন্ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রবল তুষারঝড় (blizzards) সংঘটিত হয়?

অ) বায়ুমণ্ডলীয়　　আ) জলীয়

ই) ভৌম (Terrestitial)　　ঈ) জীবমণ্ডলীয়

2) **নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের 30 শব্দে উত্তর দাও :**

ক) দুর্যোগ কখন বিপর্যয়ে পরিণত হয়?

খ) হিমালয় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে অধিক ভূমিকম্প হয় কেন?

গ) ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশগুলো কী কী?

ঘ) পূর্বভারতের বন্যা পশ্চিম ভারতের বন্যা থেকে স্বতন্ত্র কীভাবে?

ঙ) মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে খরার প্রবণতা বেশি কেন?

3) **নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের 125 টি শব্দে উত্তর দাও :**

ক) ভারতের ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চলসমূহকে চিহ্নিত করো এবং এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের কিছু উপায় লেখো।

খ) বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চল বলতে কী বোঝ। খরাপ্রবণতার ভিত্তিতে ভারতকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলে বিভক্ত করো এবং তার উত্তরণের উপায়সমূহ লেখো।

গ) উন্নয়ন মূলক কাজ কখন বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়?

প্রকল্প মূলক কাজ :

নিম্নে প্রদত্ত বিষয় অনুসারে প্রকল্প তৈরি করো :

i) মালপা ভূমিধস

ii) সুনামি

iii) ওড়িশা ও গুজরাটের ঘূর্ণিঝড়

iv) নদীর আন্তঃসংযোগ

v) তেহরি বাঁধ / সরদার সরোবর

vi) ভূজ / লাতুর ভূমিকম্প

vii) ব-দ্বীপের জীবনযাত্রা / নদীদ্বীপের জীবনযাত্রা

viii) বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ মডেল তৈরি করো।

পরিশিষ্ট - I

রাজ্যসমূহ, তাদের রাজধানী সমূহ, জেলার সংখ্যা, আয়তন ও জনসংখ্যা

ক্রমিক নং	রাজ্য	রাজধানী	জেলার সংখ্যা	আয়তন (বর্গ কিমি)	জনসংখ্যা
1	অন্ধ্রপ্রদেশ **	হায়দ্রাবাদ	23	2,75,060	8,46,65,53
2	অরুণাচল প্রদেশ	ইটানগর	16	83,743	13,82,611
3	আসাম	দিসপুর	27	78,438	3,11,69,272
4	বিহার	পাটনা	38	94,163	10,38,04,637
5	ছত্রিশগড়	রায়পুর	18	1,36,034	2,55,40,196
6	গোয়া	পানাজি	2	3,702	14,57,723
7	গুজরাট	গান্ধিনগর	26	1,96,024	6,03,83,628
8	হরিয়ানা	চণ্ডীগড়	21	44,212	2,53,53,081
9	হিমাচল প্রদেশ	সিমলা	12	55,673	68,56,509
10	জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর	15	2,22,236	1,25,48,926
11	ঝাড়খণ্ড	রাঁচি	24	79,716	3,29,66,238
12	কর্ণাটক	ব্যাঙ্গালুরু	30	1,91,791	6,11,30,704
13	কেরালা	তিরুবনন্তপুরম	14	38,863	3,33,87,677
14	মধ্যপ্রদেশ	ভোপাল	50	3,08,000	7,25,97,565
15	মহারাষ্ট্র	মুম্বাই	35	3,07,713	11,23,72,972
16	মণিপুর	ইম্ফল	9	22,327	27,21,756
17	মেঘালয়	শিলং	7	22,327	29,64,007
18	মিজোরাম	আইজল	8	21,081	10,91,014
19	নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা	11	16,579	19,80,602
20	ওড়িশা	ভুবনেশ্বর	30	1,55,707	4,19,47,358
21	পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়	20	50,362	2,77,04,236
22	রাজস্থান	জয়পুর	33	3,42,239	6,86,21,012
23	সিকিম	গ্যাংটক	4	7,096	6,07,688
24	তামিলনাড়ু	চেন্নাই	32	1,30,058	7,21,38,958
25	ত্রিপুরা	আগরতলা	8	10,49,169	36,71,032
26	উত্তরাঞ্চল	দেরাদুন	13	53,484	1,01,16,752
27	উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	71	2,38,566	19,95,81,477
28	পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা	19	88,752	9,13,47,736

উৎস - *http://india.gov.in* 18.04.13 অনুসারে

* জনগণনা 2011, অস্থায়ী তথ্য।

* 2012 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরার জেলা সংখ্যা বেড়ে 8 টি হয়েছে।

* দ্রষ্টব্য - 2014 সালের জুন মাসে তেলেঙ্গানা ভারতের 29 তম রাজ্যের স্বীকৃতি পায় এবং তার রাজধানী হায়দ্রাবাদ।

পরিশিষ্ট - II

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, তাদের রাজধানী, আয়তন এবং জনসংখ্যা

ক্রমিক নং	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	রাজধানী	জেলার সংখ্যা	আয়তন	জনসংখ্যা
1	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্টব্লেয়ার	3	8, 249	3,79, 944
2	চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়	1	114	10,54, 686
3	দাদরা ও নগর হাভেলী	সিলভাসা	1	491	3,42, 853
4	দমন ও দিউ	দমন	2	112	2,42, 911
5	জাতীয় রাজধানী (NCT) দিল্লি	দিল্লি	9	1, 483	1,67,53, 235
6	লাক্ষাদ্বীপ	কাভারাত্তি	1	32	64, 429
7	পুদুচেরী	পুদুচেরী	4	492	12,44, 464

উৎস -*http://india.gov.in* - 18.04.13 অনুসারে

* জনগণনা 2011, অস্থায়ী তথ্য,

পরিশিষ্ট - III

জলের প্রাপ্যতা - অববাহিকা অনুযায়ী

ক্রমিক নং	নদী অববাহিকার নাম	বার্ষিক গড় প্রাপ্যতা (কিউবিক কিমি / বছর)
1	সিন্ধু (সীমান্ত পর্যন্ত)	73.31
2	ক) গঙ্গা	525.02
	খ) ব্রহ্মপুত্র, বরাক ও অন্যান্য	585.60
3	গোদাবরী	110.54
4	কৃষ্ণা	78.12
5	কাবেরী	21.36
6	পেন্নার	6.32
7	পেন্নার ও মহানদীর মধ্যবর্তী পূর্ববাহিনী নদীসমূহ	22.52
8	পেন্নার ও কন্যাকুমারীর মধ্যবর্তী পূর্ববাহিনী নদী সমূহ	16.46
9	মহানদী	66.88
10	ব্রাহ্মনী এবং বৈতরণী	28.48
11	সুবর্ণরেখা	12.37
12	সবরমতী	3.81
13	মাহী	11.02
14	কচ্ছ, সবরমতী ও লুনিসহ পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ	15.10
15	নর্মদা	45.64
16	তাপী	14.88
17	তাপী থেকে তাদ্রী পর্যন্ত পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ	87.41
18	তাদ্রী থেকে কন্যাকুমারী পযর্ন্ত পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ	113.53
19	রাজস্থানের মরুঅঞ্চলের অন্তর্বাহী নদীসমূহ	নেই (NEG)
20	বাংলাদেশ ও বার্মার প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী অববাহিকা সমূহ	31.00
	মোট	**1869.35**

উৎস - *http://mowr.gov.in* - 18-04-13 অনুযায়ী

পরিশিষ্ট - IV

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনুসারে অরণ্যাবৃত স্থান (প্রতি বর্গ কিমিতে)

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	ভৌগোলিক আয়তন	2013 -তে অরণ্যাবৃত স্থানের পরিমাপ			
		অতি নিবিড়	নিবিড়	বিরল	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ *	275,069	850	26,079	19,187	46,116
অরুণাচল প্রদেশ	83,743	20,828	31,414	15,079	67,321
আসাম	78,438	1,444	11,345	14,882	27,671
বিহার	94,163	247	3,380	3,664	7,291
ছত্তিশগড়	135,191	4,153	34,865	16,603	55,621
দিল্লি	1,483	6.76	49.38	123.67	179.81
গোয়া	3,702	543	585	1,091	2,219
গুজরাট	196,022	376	5,220	9,057	14,653
হরিয়ানা	44,212	27	453	1,106	1,586
হিমাচল প্রদেশ	55,673	3,224	6,381	5,078	14,683
জম্মু ও কাশ্মীর	222,236	4,140	8,760	9,638	22,538
ঝাড়খণ্ড	79,714	2,587	9,667	11,219	23,473
কর্ণাটক	191,791	1,777	20,179	14,176	36,132
কেরালা	38,863	1,529	9,401	6,992	17,922
মধ্যপ্রদেশ	308,245	6,632	34,921	35,969	77,522
মহারাষ্ট্র	307,713	8,720	20,770	21,142	50,632
মণিপুর	22,327	728	6,094	10,168	16,990
মেঘালয়	22,429	449	9,689	7,150	17,288
মিজোরাম	21,081	138	5,900	13,016	19,054
নাগাল্যাণ্ড	16,579	1,298	4,736	7,010	13,044
ওড়িশা	155,707	7,042	21,298	22,007	50,347
পাঞ্জাব	50,362	0	736	1,036	1,772
রাজস্থান	342,239	72	4,424	11,590	16,086
সিকিম	7,096	500	2,161	679	3,358
তামিলনাড়ু	130,058	2,948	10,199	10,697	23,844
ত্রিপুরা	10,486	109	4,641	3,116	7,866
উত্তরপ্রদেশ	240,928	1,623	4,550	8,176	14,349
উত্তরাঞ্চল	53,483	4,785	14,111	5,612	24,508
পশ্চিমবঙ্গ	88,752	2,971	4,146	9,688	16,805
আন্দামান ও নিকোবর	8,249	3,754	2,413	544	6,711
চণ্ডীগড়	114	136	9.66	6.24	17.26
দাদরা ও নগর হাভেলী	491	0	114	99	213
দমন ও দিউ	12	0	1.87	7.4	9.27
লাক্ষাদ্বীপ	32	0	17.18	9.88	27.06
পুদুচেরী	480	0	35.23	14.83	50.06
মোট	**3,287,263**	**83,502**	**3,18,745**	**2,95,651**	**6,97,898**

উৎস : ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট, 2013 (India State of Forest Report, 2013)

* **দ্রষ্টব্য :** 2014 সালের জুন মাসে তেলেঙ্গানা ভারতের 29 তম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরিশিষ্ট - V

রাজ্যভিত্তিক দেশের সংরক্ষিত অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	সংরক্ষিত ভূমির সংখ্যা	গোষ্ঠীবদ্ধ সংরক্ষণের সংখ্যা
1	অন্ধ্রপ্রদেশ	6	21	0	0
2	অরুণাচলর প্রদেশ	2	11	0	0
3	আসাম	5	18	0	0
4	বিহার	1	12	0	0
5	ছত্তিশগড়	3	11	0	0
6	গোয়া	1	6	0	0
7	গুজরাট	4	23	1	0
8	হরিয়ানা	2	8	2	0
9	হিমাচল প্রদেশ	5	32	0	0
10	জম্মু ও কাশ্মীর	4	15	34	0
11	ঝাড়খণ্ড	1	11	0	0
12	কর্ণাটক	5	22	2	1
13	কেরালা	6	16	0	1
14	মধ্যপ্রদেশ	9	25	0	0
15	মহারাষ্ট্র	6	35	1	0
16	মণিপুর	1	1	0	0
17	মেঘালয়	2	3	0	0
18	মিজোরাম	2	8	0	0
19	নাগাল্যাণ্ড	1	3	0	0
20	ওড়িশা	2	18	0	0
21	পাঞ্জাব	0	13	1	2
22	রাজস্থান	5	25	3	0
23	সিকিম	1	7	0	0
24	তামিলনাড়ু	5	21	1	0
25	ত্রিপুরা	2	4	0	0
26	উত্তরপ্রদেশ	1	23	0	0
27	উত্তরাঞ্চল	6	7	2	0
28	পশ্চিমবঙ্গ	5	15	0	0
29	আন্দামান ও নিকোবর	9	96	0	0
30	চণ্ডীগড়	0	2	0	0
31	দাদরা ও নগর হাভেলী	0	1	0	0
32	লাক্ষাদ্বীপ	0	1	0	0
33	দমন ও দ্বীপ	0	1	0	0
34	দিল্লি	0	1	0	0
35	পুদুচেরী	0	1	0	0
সর্বমোট		**102**	**517**	**47**	**4**

উৎস : বার্ষিক রিপোর্ট 2013 - 14, ফরেস্ট সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া

শব্দকোশ

পলল সমভূমি (Alluvial Plain) : এই সমভূমি নদীবাহিত পলি বা সূক্ষ্ম শিলা কণা দ্বারা গঠিত।

দ্বীপমালা (Archipelago) : সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো দ্বীপ যখন পরস্পরের পাশে অবস্থান করে।

শুষ্কতা (Arid) : কোনো জলবায়ু অঞ্চলে যখন পরিমিত বৃষ্টিপাতের অভাবে কিছুমাত্র উদ্ভিদ জন্মায়।

ব্যাকওয়াটার (Backwater) : একটি নদীপ্রবাহের প্রধান প্রবাহ পার্শ্বপথ দিয়ে প্রবাহিত হলেও তার সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অত্যন্ত ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়।

আদিশিলা (Bedrock) : কঠিন শিলার তলদেশস্থ মাটি ও আবহবিকার জনিত পদার্থ সমূহ।

জীবমণ্ডল সংরক্ষণ (Biosphere Reserve) : এগুলো বহুমুখী উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অঞ্চল যেখানে বিভিন্ন আকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের স্বাভাবিক আবাসে সংরক্ষিত থাকে, এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল - i) সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য বজায় রাখা, যেমন - প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদকুল (Flora) ও প্রাণীকুল (Fauna) ii) বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য গবেষণায় উন্নীতকরণ এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদান সংরক্ষণ করা; iii) শিক্ষা, সচেতন এবং ব্যাখ্যা করার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

বাঁধনির্মাণ (Bunding) : ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাটি ও জল সংরক্ষণের জন্য মাটি বা পাথর দিয়ে বাঁধ নির্মাণের প্রয়াস করা।

চুন মিশ্রিত (Calcarcous) : অধিক পরিমাণে ক্যালশিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণ বা ধারণ।

অববাহিকা অঞ্চল (Catchment Area) : প্রধান নদী ও তার উপনদীবাহিত অঞ্চল।

জলবায়ু (Climate) : পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আবহওয়ার বিভিন্ন উপাদানের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে (কমপক্ষে 30 বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা)।

উপকূল ভাগ (Coast) : স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যবর্তী সীমানা। সমুদ্র উপকূলের উন্মুক্ত অংশ এর অন্তর্গত।

উপকূলীয় সমভূমি (Coastal Plain) : উপকূলরেখা ও দেশের স্থলভাগের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমি।

সংরক্ষণ (Conservation) : সংরক্ষণ বলতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করাকে বোঝায়। খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপন, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও বনভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং অপব্যবহার রোধ করা প্রভৃতি এর অন্তর্ভূক্ত।

প্রবাল (Coral) : এটি সাধারণত ক্যালশিয়াম ক্ষরণের ফলে সৃষ্ট একধরনের ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রবালকীট, যা প্রধানত উষ্ণ অগভীর সমুদ্রে দেখা যায়। এরফলে প্রবালপ্রাচীর সৃষ্টি হয়।

নিম্নচাপ (Depression) : আবহবিদ্যায় নিম্নচাপ বলতে কোনো অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যখন কম থাকে তাকে বোঝায়, যা প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়। এটা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত নামেও পরিচিত।

মোহনা (Estuary) : জোয়ারের সময় নদীর স্বাদু জল যেখানে সমুদ্রের লবনাক্ত জলের সাথে মিশে যায়।

প্রাণীকুল (Fauna) : কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সময়ের প্রাণীজগত।

ভাঁজ (Fold) : পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো অঞ্চলে সংকোচনের ফলে শিলাস্তর বেঁকে ভাঁজ সৃষ্টি হয়।

হিমবাহ (Glacier) : হিমবাহ হল, বিশালাকৃতির বরফ বা তুষার যখন ধীরগতিতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে নিম্নমুখী প্রবাহিত হয় এবং তার গতিপথে খাঁড়া ঢালবিশিষ্ট উপত্যকা গঠন করে।

নিস্ (Gneiss) : মোটা দানাযুক্ত সংবদ্ধ রূপান্তরিত শিলা। অতিরিক্ত তাপ ও চাপে পবর্তগঠন ও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই শিলা সৃষ্টি হয়।

গিরিখাত (Gorge) - খাড়া এবং প্রস্তরময় পার্শ্ববিশিষ্ট গভীর উপত্যকা।

নালিক্ষয় (Gully Erosion) - জলপ্রবাহ দ্বারা মাটি ও শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সংকীর্ণ খাত বা নালারূপে প্রবাহিত হয়।

হিউমাস (Humus) - মাটিতে অবস্থিত মৃত জৈব উপাদান।

দ্বীপ (Island) - চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলাভূমি এবং এটি মহাদেশের তুলনায় আয়তনে ছোটো।

জেট প্রবাহ (Jet Stream) - ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক নিম্নভাগ দিয়ে প্রবাহিত খুব শক্তিশালী এবং অবিরত প্রবহমান পশ্চিমা বায়ু।

হ্রদ (Lake) - পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ গহ্বরে আবদ্ধ জলরাশি যা চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত।

ভূমিধস (Landside) - ব্যাপক আলোড়নের ফলে গঠিত শিলা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে দ্রুত নিম্নমুখে ধাবিত হয়।

নদী বাঁক (Meander) - নদীর প্রবাহপথে সুস্পষ্ট বাঁক বা লুপ (Loop)।

মৌসুমি (Moonsoon) - ঋতু পরিবতর্নের সাথে সাথে বিশাল অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ।

জাতীয় উদ্যান (national park) - জাতীয় উদ্যান হল বন্যপ্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেখানে বৃক্ষচ্ছেদন, পশুপালন বা কৃষিকাজ নিষিদ্ধ।

গিরিপথ (Pass) - কোনো পবর্তশ্রেণির কোল (Col) বা ফাঁক বরাবর মধ্যভাগ দিয়ে তৈরি পথ।

উপদ্বীপ (Peninsula) - সমুদ্র থেকে অভিক্ষিপ্ত হয়ে খণ্ডিত ভূমিভাগ।

সমভূমি (Plain) - ব্যাপক অঞ্চলজুড়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমিভাগ।

মালভূমি (Plateau) - সমতলভূমি অপেক্ষা উঁচু বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ।

প্লায়া (Playa) - অন্তর্বাহী নদী অববাহিকার মধ্যবর্তী নিম্ন সমতল ভূমিভাগ। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে প্রায় দেখা যায়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Protected Forest) - ভারতের বন আইন বা রাজ্য বন আইন দ্বারা ভারতের কিছু অঞ্চলকে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সকল প্রকার কাজ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়।

নদীপ্রপাত (Rapids) - কোনো অঞ্চলের উপর দিয়ে নদী দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হওয়ার সময় কঠিন শিলার উপস্থিতিতে অকস্মাৎ খাড়া ঢালযুক্ত হয়।

সুরক্ষিত বনভূমি (Reserved Forest) - ভারতের বন আইন বা রাজ্য বন আইন দ্বারা ভারতের কিছু অঞ্চলকে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সকলপ্রকার কাজ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়।

অভয়ারণ্য (Sanctuary) - অভয়ারণ্য হল এমন একটি অঞ্চল যা শুধুমাত্র পশুদের জন্য সংরক্ষিত এবং সেখানে বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি না করে বনভূমি থেকে কাঠসংগ্রহ ও গৌণ বনজ সম্পদ সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়।

মৃত্তিকা পরিলেখ (Soil profile) - জনক শিলা থেকে ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ।

উপমহাদেশ (Sub continent) - মহাদেশের অবশিষ্টাংশ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশাল ভৌগোলিক একক।

তরাই (Tarai) - পলল ব্যজনীর নিম্নভাগে অবস্থিত জলময় ভূমি ও উদ্ভিদময় অঞ্চল।

সঞ্চরণ (Tectonic) - পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে উৎপন্ন শক্তি যখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের জন্য দায়ী।

অসংরক্ষিত বনাঞ্চল (Unclassed Forest) - কোনো অঞ্চল যখন বনভূমি হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা সুরক্ষিত বনভূমির পর্যায়ভুক্ত নয় তখন সেটাকে অসংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়। এসকল বনভূমির মালিকানা রাজ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।